বিমলা।

(আখ্যায়িকা।)

শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

বলরাম দের ষ্ট্রীট ৬নং ভবনস্থ

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৩

উপহার।

ভক্তিভাজন, অগ্রজ

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যা

মহাশয়ের

শ্রীপাদ-পদ্মে

গ্রন্থকার এই সামান্য গ্রন্থ খানি

অকপট ভক্তির

চিহ্ন স্বরূপে

সমর্পণ করিয়া সুখী

হইল।

ইতি।

বিমলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বলি কি না বলি?

অবন্তীপুর গণ্ডগ্রামের দক্ষিণ সীমায় একটী সুপরিষ্কৃত সামন্তি ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী বসিয়া লিখিতেছেন। তাঁহার অনিন্দ্য বদনে চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত, বিশাল লোচন-যুগল অশ্রুবারি পরিপ্লুত। ঘন-কৃষ্ণ কেশ-রাশি অসম্বদ্ধ—উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অংশ নিপতিত—গুচ্ছ-দ্বয় দ্বারা পরিণত বক্ষঃস্থল সমাবৃত। যুবতীর পরিধান অতি নির্ম্মল শ্বেত শাটী। তাঁহার হস্তে দুই গাছি স্বর্ণ বলয়, কণ্ঠে সৌবর্ণ্য কণ্ঠী, কর্ণে হিরণ্ময় দুল বিলম্বিত। দেহে অন্য আভরণ নাই। যুবতীর বর্ণ উষার সৌর-কর-রাশির ন্যায়। বঙ্গাঙ্গনার দেহে তাদৃশ বর্ণ সম্ভবে না। যিহুদির বর্ণের সহিত তদীয় বিমল বর্ণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নবীনার নেত্রদ্বয় বিশাল, আয়ত ও মনোহর। তাহা সলজ্জ মধুরভাবে পরিপুরিত। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বথা কমনীয়। অপূর্ব্ব যৌবন-শ্রী তাঁহার বর-বপুর সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত। সমস্ত অঙ্গই যথোপযুক্ত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত।

নবীনা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন তাহা অতি সামান্য, কিন্তু অতি পরিষ্কার। একখানি পরিষ্কার শয্যাচ্ছাদিত খট্টায় যুবতী উপবিষ্টা, তাঁহার সম্মুখে লেখ্য সামগ্রী সমন্বিত একটী বাক্স। খট্টার সন্নিকটে একটী সুন্দর সিন্দুক। তদুপরি কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকাদি,—ভিতরে কি আছে তাহা জানি না; সম্ভবতঃ তাহাতে নবীনার বস্ত্রাদি পরি-রক্ষিত আছে।

নবীনার লিখন পরিসমাপ্ত হইল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া কতকগুলি পূর্ব্ব-লিখিত পত্রের সহিত উপস্থিত লিপি একত্রিত করিলেন। পরিশেষে সমস্ত একখানি আবরণ মধ্যগত করিয়া তদুপরি শিরোনাম লিখিলেন। লিখিলেন,—"শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমীপেষু—" লিপি সমাধা করিয়া তাহা বাক্সের উপর রক্ষা করিলেন।

পত্রিকা সমাপন করিয়া যুবতী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং উপাধানে মুখ লুকাইয়া সেই শয্যায় অধোবদনে শুইয়া পড়িলেন। এই সময়—তাঁহার পশ্চাদ্দিকস্থ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া একটী সুন্দর যুবক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবক নিঃশব্দ পাদ-সঞ্চারে খট্টা-সন্নিধানে আগমন করিলেন। যুবতী তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। আগন্তুকের মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত, গম্ভীর, সতেজ ও রমণীয়। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল ও গৌর। নেত্রদ্বয় বুদ্ধির ও প্রতিভার জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। মস্তকের কেশ অব্যবস্থিত ভাবে নিপতিত। তাহা বিশৃঙ্খল, তৎপক্ষে যুবকের বিশেষ মনোযোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। দেহ উচ্চ ও পরিণত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৈহিক শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার বদনের ভাব তেজ ও নির্ভীকতা প্রকাশক। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও আড়ম্বর পরিশূন্য।

যুবক আসিলেন, যুবতী তাহা জানিতে পারিলেন না। হয়ত জানিতে না পারাই যুবকের উদ্দেশ্য; কারণ তাঁহার গতি অতি ধীর ও মন্থর। আগন্তুক খট্টা-সন্নিহিত হইয়া নবীনার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। কোন অব্যক্ত কারণে যুবতী যে মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন তাহা যুবক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যুবকের হৃদয় ভাবনায় অবসন্ন হইল—বদন বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল।

নবীনার অবেণী-সম্বদ্ধ কেশরাশি, তাঁহার কমনীয় কান্তি আচ্ছাদিত করিয়া অতি মনোহর ও স্বাভাবিক ভাবে নিপতিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে, চিকুরদামের বিরল বিনিবেশ বশতঃ, যুবতীর অতি মনোহর উজ্জ্বল বর্ণের আভা বিভাসিত হইতেছে। যেন নীল নভস্তলে, তারাগণ সহ শশধর শোভা পাইতেছে; বা নীল সিন্ধু-নিধি-হৃদয়ে আলোকালয়

(লাইট হাউস) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অথবা নীল জলে অমল কর্ম ভাসিতেছে। কিন্তু সে শোভা—সে অপার্থিব সৌন্দর্য্য তখন যুবকে চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইল না। যুবতীর কাতর ভাবই তখন তাঁহার চিত্তের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। সহসা তাঁহার চক্ষু নবীনার সম্মুখস্থ লিপির প্রতি পরিচালিত হইল। তিনি তাহার শিরোনাম পাঠ করিলেন। তাঁহার চিত্ত দারুণ সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অতি কোমল ও সস্নেহ স্বরে ডাকিলেন,—

"বিমলা।"

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্তে ললাট-নিপতিত কেশস্তব, অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখস্থ যুবকের দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। তাহার বদন বিশুষ্ক হইয়া আসিল, এবং লোচনদ্বয় অশ্রু সমাকুল হইয়া উঠিল। তাহার ভাব দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হইল যে, তিনি এতক্ষণ যে অবক্তব্য যাতনা-ভারে প্রপীড়িতা ছিলেন সেই যাতনা অধুনা শত গুণে সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্রীড়া সহকারে মস্তক অবনত করিলেন। লজ্জায় [illegible] হইয়া উঠিল। লোচন যুগল মনোহর আবেশময় ভাব ধারণ করিল। অধর প্রান্তে ঈষৎ সলজ্জ হাসি দেখা দিল। কি মনোহর! কি নয়ন-রঞ্জক! যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বিমলা! এখানে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

বিমলা পত্রখানি অপসারিত করিবার চেষ্টায় হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বেই যুবক জিজ্ঞাসিলেন,—

"ও কাহার পত্র বিমলা?"

বিমলা ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"ও কিছু নয়, তুমি ব'স।"

যুবক কহিলেন,—

"বিমলে! একটী কথা তোমাকে বলি বলি করিয়া এত দিন বলিয়া উঠিতে পারি নাই। ইদানীং কিছুদিন হইতে তোমার পূর্ব্ব-ভাবের যেন কতকটা অন্যথা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। আজি যেন সেই ভাবান্তর আরও প্রবল দেখিতেছি। তোমার অপূর্ব্ব

রলতা, সেই মধুরভাব, আমার আগমনে সেই প্রফুল্লতা, আজি সে সমস্তের বড়ই অন্যথা দেখিতেছি। বিমলি! তবে এখন হইতে বুঝিতে হইবে কি, যে আমি তোমার হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অন্তরিত হইতেছি?"

বিমলার বিষণ্ণ বদনে সমধিক বিষাদ চিহ্ন প্রকাশিত হইল। তথাপি ঈষৎ হাস্য সহকারে তিনি বলিলেন,—

"আমি বাতুলের কথায় উত্তর দিই না।"

যুবতী যে পত্র লিখিতেছিলেন তাহার কোন বৃত্তান্ত না জানিলেও, যুবকেরমনে কেমন একটা আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। তিনি অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"বিমল! ও কাহার পত্র বলিলে না? তুমি না বলিলে—আমি বলিতে পারি।"

বিমলা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন,—

"বল দেখি কাহার পত্র?"

যুবক হাসিয়া কহিলেন,—

"যাহার হৃদয় সে চাহিতেছে, দাও।"

যুবতী পত্রী গোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুবক হাসিয়া কহিলেন,—

"কেন গোপন করিতেছ? ও আমার পত্র, আমি উহা দেখিব।"

যুবতীর মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি কহিলেন,—

"কি দেখিবে, উহাতে কিছুই নাই।"

যোগেশ কহিলেন,—

"কিছু থাকুক বা না থাকুক, আমার পত্র আমি দেখিব, উহাতে তোমার আপত্তি কি?"

বিমলা বলিলেন,—

"তোমারই পত্র বটে। কিন্তু এখন তোমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন নাই।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—

"কিন্তু পত্র যদি না দিও, তবে উহার মধ্যে যাহা লিখিয়াছ তাহার মর্ম্ম আমাকে বল।"

বিমলা ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; বুঝিলেন পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করা, বা যাঁহার উদ্দেশে তাহা লিখিত হইয়াছে, তাঁহাকে তাহা পাঠ করিতে দেওয়া উভয়ই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে ভাবের প্রাবল্যে পত্র লিখিয়াছেন সে ভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও. যাঁহার উদ্দেশে তাহা লিখিত এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া বিমলার পূর্ব্ব সাহস বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া কহিলেন,—

"পত্রে যাহা আছে তাহা তোমার আর জানিয়া কাজ নাই।"

যোগেশ বুঝিতে পারিলেন, বিমলা বাক্য সমাপনের পর একটী অনতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বদনে নিদারুণ বিষাদের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। প্রণয়ীর হৃদয়ে এ ভাব আঘাত করিল। যোগেশ বলিলেন,—

"বিমল! পত্রের কথায় যদি তোমার হৃদয়ে কোনরূপ ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকি, তবে আর উহা দেখিতে চাহিব না। যাহাতে তোমার অন্তরে কষ্ট জন্মে, সেরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। স্থির বিশ্বাস আছে, এ জীবনে কখন সেরূপ মতি হইবে না। যদি পত্র দেখাইতে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আর কখন এ মুখ হইতে, ও কথার উত্থাপনও শুনিতে পাইবে না। জিজ্ঞাসা করি—কোন আপত্তি আছে কি?"

বিমলা নির্ব্বিঘ্ন ভাবে কহিলেন,—

"পত্র তোমার উদ্দেশেই লিখিত—তা তুমি দেখিবে—তা—"

বিমলা আর কিছু বলিলেন না। যোগেশ বুঝিলেন, স্ত্রী-স্বভাবসুলভ—বিশেষ বিমলার ন্যায় রমণী-চরিত্র-গত—লজ্জা ভিন্ন অন্য আপত্তি কিছুই নাই। বিমলা তাঁহাকেই পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাহা দেখাইতে বা তাঁহার নিকট তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অস্বীকার কেন, যোগেশ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল লজ্জাই কি ইহার কারণ? না, আর কিছু আছে। বিমলা তাঁহাকে কি লিখিয়াছেন? ভাবিলেন—লিপি মধ্যে হয়ত অশুভ সংবাদ আছে; হয়ত সেই সংবাদ আমার বহু-যত্ন-পালিত আশা লতার মূলে কুঠারাঘাত করিবে; হয়ত সেই

সংবাদ আমার সম্মুখে ভবিষ্যতের অন্ধকারময় অসুখ-পূর্ণ দ্বার উদ্ঘাটিত করিবে, হয়ত সেই সংবাদ আমার সুখ-চন্দ্রিমা বিরাজিত হৃদয়-গগনে ঘোর অমানিশা উপস্থিত করিবে। এ সন্দেহ তাঁহাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শুভ সংবাদ অপেক্ষা মনুষ্য নিয়ত অশুভ সংবাদসম্বন্ধে সমধিক চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জননী শয়নে, স্বপ্নে ভাবিয়া থাকেন, হয়ত তাঁহার প্রবাস-গত প্রিয় পুত্র পীড়া কাতর হইয়াছে, তথায় এমন আত্মীয় কেহ নাই যে, তাহার ব্যাধি-বিকলিত চিত্তের সান্ত্বনা করে, বা ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা যথোপযুক্ত সুশ্রূষা করে। এবম্বিধ প্রিয়জন জন্য দুশ্চিন্তার সমধিক উদাহরণ ও প্রয়োগ স্থল প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা মনুষ্য-হৃদয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। এই চিরন্তন ধর্ম্মই সন্দেহের মূল। ইহাই নায়ক-নায়িকার প্রণয়-নিকেতনে বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চারণেরকারণ। এই মনোবৃত্তির শাখা প্রশাখা হইতে জগতে কত সময় কত লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে! এই মন্দ সন্দেহই সেক্ষপীরের "ওথেলো" নাটকের জীবন; তাঁহার অন্যান্য অধিকাংশ নাটকেও ইহার ছায়া আছে। এই মনোবৃত্তি রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যের পদে পদে প্রকাশিত, অনেক সংস্কৃত কাব্য নাটকও ইহার সংশ্রব শূন্য নহে। বঙ্গীয় বিস্তর কাব্যে ইহার আভাষ আছে।

যোগেশ আবার ভাবিতে লাগিলেন, হয়ত লিপি মধ্যে আমার ঈপ্সিত সংবাদ আছে। আশা, সংসার সাগরস্থিত, বিপদ-বাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর সুদৃঢ় কর্ণধার। আশার ছলনায় কে না ভুলে? যে না ভুলে, জানিও তাহার হৃদয়-প্রবাহে জোয়ার ভাটা নাই; তাহার হৃদয়-গগনে অমানিশার অন্ধকার ভিন্ন পৌর্ণমাসীর শুক্ল স্নিগ্ধ আলোক কখন প্রকাশ পায় না। দারুণ যন্ত্রণা ও ক্লেশ-রাশি-পরিপ্লুত সংসার-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যে একবারও আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত অননুভূত-পূর্ব্ব সুখ সম্বন্ধে কল্পনা করে নাই, নিশ্চয়ই সে সংসারের কিছুই জানে না। সংসারের কোন সুখই সম্ভোগ করে নাই। যোগেশ আশার ছলনায় ভুলিলেন। ভাবিলেন, পত্রে বুঝি সুসংবাদ আছে। ব্যগ্রতা সহ বলিলেন,—

"বিমল ! তবে পত্র দেও, কি লিখিয়াছ দেখি। যদি না দেও, তবে উহাতে কি লিখিত আছে বল।"

বিমলা সঙ্কুচিত হইলেন। পত্র দেওয়া দুরূহ, বলা আরও কঠিন। সুতরাং কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায় অবনত-মস্তকে পত্রিকা হস্তে বসিয়া রহিলেন। যোগেশ বলিলেন,—

"যদি না বলিলে, তবে পত্র দেও।"

অনন্যোপায় হইয়া বিমলা অগত্যা যোগেশকে পত্র দিলেন। কহিলেন,—

"আমি তোমার কথা শুনিলাম, তুমি আমার কথা শুনিবে না?"

যোগেশ কহিলেন,—

"তুমি যাহা বলিবে, তাহা যদি অসাধ্য হয়, তথাপি শুনিব

বিমলা ঈষৎ বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,—

"তুমি পত্র এখনই এখানে বসিয়া পড়িতে পাইবে না, সময়ান্তে উহা পাঠ করিও। তাহা হইলে আমি সুখী হইব।"

যোগেশ পত্র উন্মোচন করিতেছিলেন, তাহা না করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—

"এই কথা, বেশ, বাটী গিয়া পত্র পড়িব। এখন পড়িব না।—বিমল! তোমার এই বালিকা ভাবের কথাগুলি কি মনোহর! চির-কালই কি সমান যাইবে?"

বিমলা মস্তক বিনত করিলেন। যোগেশ আবার কহিলেন,—

"বিমল! পত্রের মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব আমি এখনই বাটী চলিলাম।"

বিমলা হাসিয়া কহিলেন,—

"আমাকে বালিকা বলিতেছিলে।"

যোগেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—

"সংসারে সকলেই বালক বালিকা, আমি যাই।"

বিমলা বলিলেন,—

"ব্যস্ত হইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, পত্র দেখিয়া তাহা উপেক্ষা করিও না। তাহাতে—"

আর বলিলেন না। যোগেশ আর কোন কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেও পারিলেন না। বিমলার সুন্দর বদন-শ্রী পুনরায় দর্শন করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। যোগেশ দৃষ্টি সীমা অতিক্রম করিলে বিমলা নয়নাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন,—

"হৃদয় দগ্ধ হও।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্র।

যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে বাটী আসিলেন। বিমলার আলয় হইতে তাঁহার নিবাস দূর নহে। সন্ধ্যা সমুপস্থিত। যোগেশের তৎপ্রতি লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয় জগতে যে ঘোরতর সন্ধ্যা সমাগত তিনি তদ্দর্শনে ব্যস্ত। হৃদয়ে সন্ধ্যা—কারণ তথায় তখন আলোক অন্ধকার দুই মিশিতেছে। আলোক—বিমলার পত্রী মধ্য হইতে সুসংবাদের আশা; অন্ধকার—বিমলার পত্র মধ্য হইতে ক্ষোভ-জনক সংবাদের ভয়। যোগেশের হৃদয়াকাশে সন্ধ্যা। বাহ্য প্রকৃতির সন্ধ্যা তাঁহার চক্ষে লাগিল না। বাটী আসিয়া যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় আলোক নাই। প্রকোষ্ঠ অন্ধকার, যোগেশ তাহা ভাবিলেন না। ত্বরায় বিমলার পত্র উন্মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল, বক্ষ বেপন সম্বর্দ্ধিত হইল। চিত্তের অবস্থা কি হইল, তাহা বর্ণনা করা সহজ নয়। পত্রিকা উন্মুক্ত হইল। যোগেশ তাহা পড়িতে বসিলেন। কিন্তু অন্ধকার হেতু এক বর্ণও পড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। উঠিয়া ভৃত্যকে আলোক দিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য আলোক আনিলে যোগেশ পত্রিকা পাঠে নিযুক্ত হইলেন। পড়িলেন,—

"যোগেশ! তোমাকে কি লিখিব? যাহা লিখিব ভাবিতেছি তাহা লিখিতে পারিতেছি না। লিখিতে পারিতেছি না, কিন্তু হৃদয়ের কথা হৃদয়ে রাখিলে তো চলিবে না। আজ এক সপ্তাহ ভাবিয়া আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি। আজ আমি মনের কথা জানাইব।

"যোগেশ! এ জীবনে আমি তোমার হইতে পারি না, তুমিও আমার হইতে পার না। এ প্রফুল্ল কুসুমদ্বয় একত্রে শোভা পায়, ইহা জগদীশ্বরের অভিপ্রায় নয়। সে সুখ, সে সন্তোষ, সে শোভার জন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। পাপ সমাজ তাহার কারণ। অদ্য যদি তোমার সহিত আমার বিবাহ হয়, কল্য তোমার জাতি যাইবে। তোমার সহিত কেহ আহার ব্যবহার করিবে না, হয়ত অনেকে কথাই কহিবে না, তুমি সমাজ মধ্যে চিরকাল ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। তাহাও হউক, তাহাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ বিবাহের পরিণামে আর এক মহদনিষ্ট ঘটিবে। হয়ত তোমার বংশ পরম্পরা চিরদিন এই অবিবেচনার ফলভোগ করিবে। আমি এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিয়াছি। স্থির বুঝিয়াছি, তোমার সহিত আমার পরিণয় অশুভের নিদান হইয়া উঠিবে। আমার অপেক্ষা ভবিষ্যতে তোমারই যন্ত্রণা অধিক হইবে। তবে কেন যোগেশ! তবে বিবাহে কাজ নাই। তুমি মনকে দৃঢ় কর।

"আমি জানি তুমি আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ কর। তুমি আমাকে যার পর নাই ভাল বাস। যদি আমি তাহা না জানিতাম, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু যোগেশ! ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমার হৃদয়, আমার আত্মা তোমার অমানুষী স্নেহ, অসীম প্রীতি, অপার উদারতার সমান প্রতিদান করে না, এমন নয়। তুমি কি তাহা জান না যোগেশ? এ হৃদয়যুগলে এ সকল কি নূতন ভাব? বিস্মৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া যতদূর সম্ভব ভূত-ঘটনা-সাগরে প্রবেশ করিতেছি, দেখিতেছি—সেই তুমি, সেই আমি; হায়! কেন ইহার বিপর্য্যয় ঘটে নাই? এ হৃদয়ের যদি কিছু স্পৃহনীয় পদার্থ থাকে, তাহা তুমি, যদি কিছু আনন্দের নিলয় থাকে, তাহা তোমার বদন, যদি কিছু সুখ থাকে, তাহা তোমার মধুমাখা কথা। যোগেশ! তুমি

দেবতা দুর্লভ সামগ্রী বলিয়াই আমার আজি এত কষ্ট। আমি অদ্য তোমাকে যে সংবাদ দিতেছি, আমার বেশ বিশ্বাস আছে, তাহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে না, তাহাতে তুমি অনুমোদন করিবে না, এবং তাহা তোমার মর্ম্মে আঘাত করিবে। কিন্তু তোমার প্রতি অবিচলিত ভক্তি, তোমার মঙ্গলে অন্তরের একান্ত অনুরাগ, তোমার সুখে আমার সুখ, প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্বন্ধ সমস্ত আজি একবাক্য হইয়া এই পরামর্শে আমার মতি জন্মাইয়া দিতেছে। তুমি মনকে দৃঢ় কর। আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি, পাষাণে হৃদয়কে গঠিত করিয়াছি। আমি পাষাণী।

"মনকে দৃঢ় কর বলিতেছি, কিন্তু মনকে দৃঢ় করা বড় কঠিন। আমার অনুরোধে যোগেশ, তুমি কি না করিয়াছ? আমার জন্য তুমি কি কষ্টই না পাইয়াছ? আমার অনুরোধে তুমি এ কষ্টও স্বীকার কর। তুমি কত দিন আমাকে বলিয়াছ যে, আমি যাহাতে সুখী হই, তাহা যদি নিতান্ত ক্লেশসাধ্য হয়, তথাপি তুমি সম্পাদনে পরমানন্দিত হও। আমি জানি তাহা তোমার মুখের কথা নহে। তোমার অন্তরের ঐ ভাব। তুমি আমার পরামর্শে কর্ণপাত করিলে, যথার্থই বলিতেছি, আমি সুখী হইব। যোগেশ, আমার এই কথাটী শুনিয়া আমাকে সুখী কর।

"যোগেশ! তোমাকে আবার বলি—এ পাপ পৃথিবী আমাদের পবিত্র প্রণয়ের স্থান নহে। তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, যে এ জীবনের পর এক রাজ্য আছে, তথায় দলাদলি নাই, কপটতা নাই, পাপ নাই। তথায় কেবল পুণ্য, সাধুতা ও পবিত্রতা বিরাজ করে। সে কি আনন্দের স্থান যোগেশ! সে স্থানে কি এখন যাওয়া যায় না? তুমি বলিয়াছিলে সকলকেই সে স্থানে যাইতে হইবে—আর আসিতে হইবে না। কি সুন্দর স্থান। সেই স্থানে আমরা মিলিব! তথায় আমাদের বিবাহ হইবে! এ সংসারে আমাদের বাসনা সফল হইবে না। এ সংসার-কাননে আমরা প্রজাপতিযুগল হইয়া উড়িতে পাইব না, এখানে আমরা কপোত কপোতিনী হইয়া বাসা বাঁধিতে পাইব না, এ মধুমক্ষিকাদ্বয় মিলিয়া এখানে মিত্র মধু-চক্র নির্ম্মাণ করিতে পাইবে না. এ শুক শারীর কথা এ জগৎ শুনিবে না। এ বৃথা

আশা ত্যাগ কর যোগেশ। এ জগতে আমাদের সম্মিলন বিধাতার ইচ্ছা নয়।

"তুমি আমার জন্য ভাবিওনা। তুমি সুখী হইলেই আমার পরম সুখ। তুমি আমার অনুরোধ শুন, চিত্ত সুস্থির কর, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। আমার জন্য তুমি এক বিন্দুও উদ্বিগ্ন হইও না। আমি জানি এ জগতে আমাদের সম্মিলন না হইলে, তোমার অশেষ মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল অপেক্ষা আমার আর কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? তোমার মঙ্গল, তোমার কল্যাণ, তোমার হিত, এ জগতে আমার প্রধান চেষ্টা। সেই জন্য অদ্য আমি হৃদয়কে লৌহবৎ কঠিন করিয়া, পাষাণবৎ দুর্ভেদ্য করিয়া, বজ্রাধিক ভয়ঙ্কর করিয়া এই কঠোর পরামর্শ লিপি-বদ্ধ করিতেছি। যাহা লিখিতেছি, জানিও তাহা আমার অন্তরের কথা। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক, সন্তোষ সহকারে, এই মত স্থির করিয়াছি; অতএব তুমি আমার জন্য ভাবিও না।

"আমার জন্য তুমি কোনরূপ অসুখী হইও না। আমি বেশ থাকিব, মনকে প্রবোধ দিব, এ জগৎ আমাদের স্থান নয়। তাই ভাবিয়া আমি স্বচ্ছন্দে থাকিব। কিন্তু তুমি—তুমি যদি অসুখী হও, তুমি যদি দুঃখিত ও ব্যথিত হও, তাহা হইলে আর আমার সুখ কোথায়? তাহা হইলে অসুখের সীমা থাকিবে না। অতএব তোমার চরণে আমার সানুনয় অনুরোধ, তুমি কদাচ চিত্তকে অস্থির হইতে দিও না। যোগেশ! তোমার জনক আছেন, জননী আছেন, ভগ্নী আছেন; তুমি অতগুলি লোকের লক্ষ্যস্থল—অতগুলি লোকের আনন্দ-ধাম। তোমার চিত্ত প্রশান্ত না থাকিলে, কেবল তুমি আমি নই, সকলেই কষ্ট পাইবেন। অতএব যোগেশ! তুমি চিত্তকে স্থির করিও।

"আর এক কথা যোগেশ! আর একটী কথা বলিয়া আমার এই কঠোর, শোকাবহলিপির শেষ করিব। তোমার একটী বিবাহ করিতে হইবে। একটী সুশীলা, সুন্দরী বালিকাকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন তুমি তাহা করিবে না? এক কারণে দুই জনের যাতনার আবশ্যক কি? যোগেশ! তুমি বিবাহ করিলে, সেই রমণী তোমাকে ভাল বাসিবে। তোমাকে স্নেহ করিবে। আমি যখন দেখিব, তুমি একটী

সুন্দরী সুশীলা রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, আর যখন দেখিব, সেই রমণী তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছে, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। কালক্রমে যোগেশ! তোমার প্রফুল্ল কুসুমবৎ আনন্দময় সন্তান হইবে; তাহারা হাসিতে হাসিতে নাচিয়া বেড়াইবে। আমি তাহাদের ক্রোড়ে লইব, অন্তরের সহিত ভাল বাসিব, মাতৃবাৎসল্যে লালন পালন করিব। যোগেশ! তুমি তাহাদের বলিয়া দিও, তাহারা যেন আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। যোগেশ! এ সকল আনন্দে তুমি বঞ্চিত হইও না। তুমি বিবাহ করিও। তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

"ভাবিও না যোগেশ! যে আমার হৃদয় তোমার প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছে, বা ভবিষ্যতে হইবে।" না তাহা নয়। এ হৃদয়ে যাহা আছে, তাহার কথা কি বলিব? তাহা আমি জগৎকে দেখাইতে চাহি না, লোককে শুনাইতে চাহি না। সে অন্তরের ভাব আমি অন্তরে বহন করিয়া সুখী হইব। যিনি জানিবার তিনি তাহা জানেন। যোগেশ তুমি কি তাহা জান না?

"এ জীবনে তোমার সহিত আমার সর্ব্বদা দেখা হইবে। দেখা হওয়াই প্রার্থনীয়। দেখা হইবে, কিন্তু পূর্ব্বের ভাব আর কিছু মনে না থাকে। এ সকল কথা স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হউক। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল, তাহা যেন তোমার আমার আর মনে না থাকে। কিন্তু যোগেশ! এ অতুলনীয় প্রণয়, অসীম স্নেহ, অবিচ্ছেদ্য ঐক্য, ইহা কি ভাসিয়া যাইবে? না তাহা অসম্ভব; জীবন যাইবে তথাপি এ স্বর্গীয় প্রবৃত্তি সমস্ত লোপ পাইবে না। ঈশ্বর করুন যেন তাহা চিরদিন সমান থাকে। তোমার সহিত আমার সতত সাক্ষাৎ হইবে যোগেশ। কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহময়ী ভগ্নী বলিয়া ভাবিও; আমিও তোমাকে পরম ভক্তিভাজন ভ্রাতা বলিয়া ভাবিব। তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে। তাহাতেই আমি সুখী থাকিব। এ কথা যোগেশ কখন ভুলিও না।

"এ জগতে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার এ পূর্ণ হৃদয়ের, পূর্ণ প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং জানিও যোগেশ তোমার আদরের,

তোমার স্নেহের বিমলা তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহে, আর কাহারও হইবে না। সংসার আমাদের বিরোধী হউক, সমাজ আমাদের পবিত্র আশা লতাকে বিদলিত করুক, এ পাপ পৃথিবী আমাদের স্বর্গীয় সুখের যথা-সাধ্য প্রতিবন্ধকতা করুক,—আমাদের অন্তরের ভাব কেহ মুছিয়া দিতে পারিবে না। তাহার ধ্বংস হইবে না। এখন না হউক, যে কোন কালে তাহা জয় লাভ করিবে। সেই হৃদয়ের অতি পবিত্র-ভাব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া—আর তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, তোমার মধুমাখা কথা সকল স্মরণ করিয়া, আমি পরম সুখে জীবন কাটাইব। এ জীবনে তাহাই আমার সুখ।

"আর কিছু লিখিব না। লেখা তো সুখের নয়! তবে লিখিয়া আর ফল কি? আমি হৃদয়কে আশ্বস্ত করিয়াছ—তুমিও তাহাই কর।

"তোমারই

"বিমলা।"

পত্র পাঠ সমাপ্ত হইল। সংজ্ঞা শূন্যের ন্যায় পত্র হস্তে যোগেশ সেই স্থলই বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মূল।

কেন বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইতে পারে না? কেন বিমলা অদ্য চির-সেবিত-প্রণয়-পাদপের বিরোধে খড়্গ ধারণে উদ্যত? এ প্রণয়ী যুগল কে? ইহাঁদের প্রণয়-মধ্যে কি রহস্য আছে? এ সকল কথা এই স্থলেই পাঠকগণকে বিদিত করা বিধেয়। উপস্থিত দুই পরিচ্ছেদ তাহাতেই পর্য্যবসিত হইবে।

বিমলার পিতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিরতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। অবন্তীপুর থাকিয়া জীবিকাপাত করা অসম্ভব হওয়ায় তিনি সম্পত্তির

অনুসন্ধানে কলিকাতায় আইসেন; তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বর্ষ মাত্র পিতা স্থবির ও অক্ষম, মাতাও বৃদ্ধা। তাঁহাদের ক্লেশ নিবারণার্থ বালক রামকুমার নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া কলিকাতা আসিলেন। পিতার যতদিন সাধ্য ছিল স্বয়ং পুত্রকে যথাসাধ্য লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। রামকুমার পিতার নিকট ব্যাকরণ অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজ কর্ম্ম হইবে ভাবিয়া রামকুমার কলিকাতা আসিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কাজ কর্ম্ম দূরে থাকুক, কলিকাতায় উদরান্নের সংস্থান হওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে রামকুমার এক জন ভদ্র মুৎস্সুদ্দির সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার অধীনে মাসিক ৮৲ আট টাকা বেতনে এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। রামকুমার অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বালক ছিলেন। অতি সহজেই প্রভু সন্তোষজনক কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভুও বড় ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন। নিঃসহায়, ব্রাহ্মণ-সন্তান রামকুমারকে উপর দয়া করিয়া তিনি তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন রামকুমার যথোচিত নিপুণতা সহকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামকুমারের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ক্রমে রামকুমারের বেতন ২০ কুড়ি টাকা হইল। এক দিন তাঁহার প্রভু বলিলেন,—"ইংরাজি না জানিলে আর উন্নতি হইবে না, অতএব রামকুমার, তুমি ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ কর।" রামকুমার প্রভুর উপদেশ বশবর্ত্তী হইয়া ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার বৎসরেক পরে রামকুমারের পিতৃবিয়োগ হইল। নিরতিশয় কাতর হইয়া রামকুমার বাটী গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া আসিলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে তিনি কিছু ঋণী হইয়া পড়িলেন। পর বৎসর রামকুমারের মাতৃদেবী গঙ্গালাভ করিলেন। যথাবিহিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাঁহাকে আরও ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, এজন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ব্যয় বাহুল্য করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ফলতঃ পুনরায় কর্জ্জ করাও অসম্ভব। পূর্ব্ববারেই রামকুমার প্রভুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন,—পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করার সুবিধা হইল না। রামকুমার প্রভুর নির্দ্দেশবশবর্ত্তী হইয়া

সংক্ষেপে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তথাপি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ঋণ-জালে বদ্ধ হইতে হইল।

রামকুমার কলিকাতায় আসিলেন। সংসারে তাঁহার আর কেহ থাকিল না। পিতৃ-মাতৃহীন রামকুমার পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; পুনরায় এক মাত্র আশ্রয়স্থল, দয়াবান্ প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া প্রভু তাঁহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। ক্রমে রামকুমার পূর্ব্ববৎ যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চারি পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। ইংরাজিতেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

এই সময় তাঁহার প্রতিপালক চেষ্টাশীল হইয়া একটী সৎপাত্রী অনুসন্ধান করত রামকুমারের বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহ কলিকাতা হইতে নির্ব্বাহিত হইল। তখন রামকুমারের বয়স দ্বাবিংশ বর্ষ। তাঁহার পত্নী দ্বাদশ বর্ষীয়া। [illegible] বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন।

প্রভুর যত্নে রামকুমার বিলক্ষণ উন্নতিশীল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আয়ও সম্বর্দ্ধিত হইল। যথাকালে রামকুমার প্রভুকে বলিলেন, ‘কন্যার অন্নপ্রাশন নিজ নিবাসে না দিলে ভাল দেখাইবে না, লোকেও বড় নিন্দা করিবে।’ তাঁহার প্রভু প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। রামকুমার যথা সাধ্য সমৃদ্ধি সহকারে অবন্তীপুরে আসিয়া কন্যার অন্নপ্রাশন ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। কন্যার নাম হইল বিমলা।

বিবিধ কারণে রামকুমার অতঃপর স্ত্রী-কন্যাকে কলিকাতার বাসায় না রাখিয়া অবন্তীপুরে রাখা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার প্রভুও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অবন্তীপুরে রামকুমারের এক সহৃদয় অকপট মিত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য। সেই মিত্রের নাম গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গাগোবিন্দ নিঃস্ব ছিলেন না। পল্লিগ্রামে দোল দুর্গোৎসব করিয়া চলে তাঁহার এমন [illegible] ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। সেই পুত্র যোগেশ। যোগেশ জ্যেষ্ঠ। তাঁহার সহোদরার সহিত উপস্থিত আখ্যায়িকার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাঁহার নাম সরমা।

গঙ্গাগোবিন্দ, রামকুমারের স্ত্রী কন্যাকে যথোচিত যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। যখন রামকুমারের পরিবার যোগেশের পিতার যত্নাধীনে পরিরক্ষিত হইল, যোগেশ তখন নিতান্ত বালক। গঙ্গাগোবিন্দ যথা সম্ভব যত্নে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যোগেশ সতত রামকুমারের বাটীতে যাতায়াত করিতেন; প্রায়ই তথায় আহার ও শয়ন করিয়া থাকিতেন। রামকুমারের স্ত্রী যোগেশকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। যোগেশের বাল্যাবস্থার কথা বড় মিষ্ট ছিল; যে শুনিত সে মুগ্ধ হইত। বিমলা তখন এক বছরের। যোগেশ, বিমলা কাঁদিলে সান্ত্বনা করিতেন। যাহাতে বিমলা সর্ব্বদা হাসে তাহার চেষ্টা করিতেন। বিমলাকে বড় ভাল বাসিতেন।

বৎসরত্রয় পরে ইংরাজি অধ্যয়নার্থ যোগেশকে রামনগরে প্রেরণ করা হইল। গঙ্গাগোবিন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগেশকে রামনগরে রাখাইয়া ইংরাজি শিক্ষা দেন। অধিক দূর দেশে গিয়া, বা অসৎ সংসর্গে মিশিয়া বা অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া, যোগেশ অর্থোপার্জ্জন করিবে এ আশায় তিনি তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষিত করেন নাই। ভদ্র সন্তানের বিদ্যাই ভূষণ। এই বিশ্বাসে তিনি পুত্রকে ইংরাজিতে কৃতবিদ্য করিতে উদ্যোগী হন। যোগেশের সোদরা সরমা সতত যোগেশের ন্যায় রামকুমারের বাটীতে যাইতেন। যোগেশ অপেক্ষা তাঁহার বয়স দুই বৎসর কম। এইরূপে উভয় পরিবার অভেদাত্মা হইয়া গেল। এরূপ ঘটিলে যথা সম্ভব আত্মীয়তা জন্মিবে তাহার সন্দেহ কি?

কলিকাতা হইতে অবন্তীপুর যাইবার সহজ উপায় ছিল না। যাতায়াতে বিলম্ব ঘটিত। এজন্য রামকুমার সতত বাটি আসিতে পারিতেন না। সময় ও সুবিধা হইলেই আসিতেন। মাসে এক বার আগমন ঘটিয়া উঠিত। তিনি আসিয়া পরিবারের যেরূপ যত্ন দেখিতেন, তাহাতে বুঝিতেন যে, তত যত্ন করিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। ফলতঃ পরিবারকে ঐরূপে পৃথক রাখিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ক্রমে বিমলার বয়স নয় বৎসর হইল। তাঁহার রূপরাশি অতুলনীয় হইয়া উঠিল। স্বভাব বয়ঃপরোন্মুক্তি মনোরম হইতে লাগিল। গুণের সীমা রহিল না। রূপে গুণে বালিকা বিমলা সকলের লোচনানন্দ-দায়িনী

ও সন্তোষবিধায়িনী হইয়া উঠিলেন। পরিচিতের মধ্যে তাঁহাকে ভাল বাসিত না, এরূপ লোক ছিল না। যে বার তাঁহাকে দেখিত, সে আবার পার বার তাঁহাকে দেখিতে চাহিত। যে একবার তাঁহার কথা শুনিত, সে পুনরায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত ব্যগ্র থাকিত। বিমলা নারী-জাতির ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

যোগেশ সর্ব্বদা বাটী আসিতেন। বাটী আসিয়া যে কয় দিন থাকিতেন তাহার অর্দ্ধাধিক কাল বিমলাদের বাটীতেই অতিবাহিত হইত। বিমলার মাতা লেখা পড়া জানিতেন। তিনি কন্যাকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

যোগেশ বাটী আসিয়া বিমলার লেখা পড়ার পরীক্ষা করিতেন, তার যাহা সন্দেহ থাকিত তাহার নিরাকরণ করিতেন, নূতন পাঠ তেন এবং নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতেন। ফলতঃ এই রূপে যোগেশ ও বিমলার মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা বদ্ধমূল হইল। সুরবদ্ধ লিত বাদ্যযন্ত্র সমূহের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ের বিশেষ একতা জন্মিল। উভয়ের হৃদয় এক কেন্দ্রাভিমুখে পরিধাবিত হইতে লাগিল। এক উদ্যানের সমভাবাপন্ন যুগল কুসুমের ন্যায় উভয়ে বিশ্বোদ্যান বিশোভিত করিতে লাগিলেন। বিমলা বালিকা—বয়স নয় বৎসর। যোগেশ বালক—বয়স ষোড়শ বর্ষ। কি আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়ম! প্রণয় কাহাকে বলে তাহা জানা নাই, ভালবাসা কিসে প্রকাশ হয় তাহা বোধ নাই, যৌবনের লীলা কি তাহার জ্ঞান নাই, কোন কার্য্যেই পার্থিব কৃত্রিমতা বা বিকার বিমিশ্রিত নাই, তথাপি স্বভাব তাঁহাদের হৃদয়-নিকেতনে পরম পবিত্র মমতা, স্নেহ ও প্রীতি পরিস্থাপিত করিল। তৎপ্রভাবে উভয়ের উভয়কে দর্শনে আনন্দ—অদর্শনে বিষাদ। ইহাই পবিত্র প্রকৃত প্রণয়ের ভিত্তি। এই স্বাভাবিক মোহাদি পরিশূন্য প্রণয় চিরস্থায়ী, অপার্থিব সম্পত্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাণ্ড।

অবন্তীপুরের জমিদার বরদাকান্ত রায় সমাজ ও দ‍.পতি। জমিদারির মধ্যে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অবিসম্বাদিত প্রভুত্ব। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক উচ্চ শ্রেণীর জীব তাঁহার ‍্যালক। এই ব্যক্তি জাতি বিষয়ে ও কুল সম্বন্ধে যাহাই হউন, অন্যান্য বিষয়ে এক মহারত্ন। আকৃতি চমৎকার, যেন আল্‌কাতরা মাথান কাষ্ঠ বিশেষ। চক্ষু কোটরগত। কখন পাঠশালায় যান নাই, সুতরাং উদরে বর্ণমালা প্রথম অক্ষরও প্রবেশ করে নাই। [illegible] রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর অন্যান্য অবয়ব অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও কেবল উদর সম অভাব সংকুলান করিয়াও পরিমাণ হইতে অধিক হইত। তিনি গুলি খাইতেন। যখন গুলির নল মুখে দিয়া রামকৃষ্ণ আড্ডায় বসিয়া চতুর্বর্গ কল লাভের পন্থা অন্বেষণ করিতেন, তখন পিপায় চোঙ্গ লাগাইয়া কে যেন আল্‌কাতরা ঢালিতেছে বোধ হইত। রামকৃষ্ণ কথাগুলি পরিষ্কার বলিতে পারিতেন না, কিছু বাধিত। গজদন্ত প্রভৃতি নানারকমের চারি পাটী দাঁত আকর্ণ বিস্তৃত ছিল। তাহাদের ঢাকিয়া রাখা তাঁহার সাধ্যাতীত। কাজেই সতত রামকৃষ্ণের হাস্যমুখ। হরিদ্রাবর্ণের ছাতা পড়া দাঁত বাহির হইয়াই থাকিত। রামকৃষ্ণ ধনবানের শ্যালক, সুতরাং তিনি বড়লোক। অবশ্য।

দেবী-সম-রূপ-গুণসম্পন্না বিমলার সহিত এই ব্যক্তির বিবাহ দিবার নিমিত্ত জমিদার বরদাকান্ত রায় রামকুমারের নিকট প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য, রামকুমার তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত হইলেন।

এই সময়ে, বিমলার সহিত যোগেশের বিবাহ হইলে বড় সুখের বিষয় হয় ভাবিয়া, উভয় পক্ষই তাহা মনে আন্দোলন করিতে লাগি-

গেন। এ যুগলকে দেখিয়া কে তাহা মনে না ভাবিয়া থাকিতে পারে? নির্ম্মল নির্ঝরবৎ যে দুই জীবন-স্রোত বিশ্ব-গিরি-নিঃসৃত হইয়া সমভাবে নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে, অনন্ত সমুদ্রবৎ অনন্ত কালাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; যে দুই সুকুমার প্রসূন সমভাবে ফুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে; যে দুই বালক বালিকার একের আনন্দ, উৎসাহ, আহ্লাদ, উন্নতি, হাস্য, রোদন প্রভৃতি অপরের সহিত সংবদ্ধ; তাঁহাদের পরস্পরের চিরন্তন সম্মিলন কাহার স্পৃহনীয় নয়? উভয় পক্ষ হইতেই এই দুইয়ের বিবাহ কামনা করিতে লাগিলেন। কোন পক্ষই, পাছে অমত হয় ভয়ে, মনের কথা অপর পক্ষকে জানাইতে সাহস করিলেন না। কিন্তু এরূপ কথা চাপিয়া রাখা সুকঠিন। কথা চাপা থাকিল না। রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়ের মনোগত জানিলেন। আনন্দের সীমা রহিল না। বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল। তাহার পর হইতে রামকুমার ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ে উভয়কে বৈবাহিক সম্বোধনে সম্ভাবিত করিতে লাগিলেন। আত্মীয়তা আরও দৃঢ় ও গাঢ় হইল।

বিমলা বালিকা। বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ অল্প বয়স্কা বালিকাদের সংস্কার অতি অপূর্ব্ব। কতকগুলি লোকজন সমবেত হইয়া গোলমাল করিয়া গ্রাম তোলপাড় করিবে, নানাবিধ বাজনা বাদ্য বাদিত হইয়া লোক জনকে অস্থির করিয়া তুলিবে, ভোজ, ফলারে বিস্তর লোক আসিয়া উদর পূরিয়া আহার করিবে, অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হইয়া এক ব্যক্তি পুরোহিতের নিদেশ মত বাক্য উচ্চারণ করিবে, বিবিধ বস্ত্র ও রঞ্জিত অলঙ্কারে শরীর সমাচ্ছন্ন হইবে—তাহার নাম বিবাহ। বিমলার বিবাহ বিষয়ে জ্ঞান প্রায় এইরূপ। এরূপ জ্ঞানহীনা বালিকাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করা বিধেয় কি না, তাহার উত্তর সামাজিক নিয়ম-নিয়ন্তাগণ বলিতে পারেন। বিমলা জানিতেন, বিবাহ আর যাহা কেন হউক না, তাহা কলহ নয়। যোগেশের সহিত কলহ মনান্তর ব্যতীত যাহাই হউক না কেন তাহাই আনন্দ। সুতরাং যোগেশের সহিত বিবাহ হইবে ভাবিয়া বিমলার আনন্দ। যোগেশের আনন্দ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ গাঢ়, অপেক্ষাকৃত সারবান্। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। সকলে পরমানন্দিত।

রামকৃষ্ণের সহিত বিবাহে অমত হওয়ায় বরদাকান্ত বিরক্ত হইয়া এত দিন চুপ করিয়া ছিলেন। ভাবিয়াছিলেন তাঁহার বিরক্তিতে ভীত হইয়া রামকুমার বিবাহে অতঃপর অমত করিবেন না। তাহা হইল না, অধিকন্তু বিমলার অন্য সম্বন্ধ হইতেছে, শুনিতে পাইয়া বরদাকান্ত পুনরায় সকোপে আজ্ঞা করিলেন,—'অনতিবিলম্বে রামকৃষ্ণের সহিত বিমলার বিবাহ দিতে হইবে। তাহার অন্যথা হইলে আমি যথাসাধ্য দণ্ড দিব।' রামকুমার গঙ্গাগোবিন্দের সহিত পরামর্শ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ঘোর বিরক্তির সহিত এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামকুমার বরদাকান্তের প্রস্তাব এককালে উপেক্ষা করিলেন। বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন, 'আমার কথা শুনিল না, দেখিব কোন্ ব্যাটা তাহার কন্যাকে বিবাহ করে।' বরদাকান্তের আদেশ ক্রমে গ্রামে রামকুমার অচলিত, এক-ঘরে ও সমাজচ্যুত হইলেন। তাঁহার অপরাধ? নৃশংসের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া অপত্য-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন না। এই তাঁহার অপরাধ! একি সহজ পাপ? ইহারই নাম বঙ্গীয় সমাজ-শাসন! তুমি বঙ্গীয় সংবাদ-পত্র-সম্পাদক! একতা, ভ্রাতৃভাব, উন্নতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া চীৎকারে মেদিনী অস্থির করিতেছ, আপনার কণ্ঠও বিদীর্ণ করিতেছ। ফল কি হইতেছে? অরণ্যে রোদন। কেবল কলিকাতা বা তদ্বৎ স্থানে স্বকীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও না। পল্লিগ্রামে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, তার পর একতা ও স্বাধীনতার ধুয়া তুলিও।

রামকুমারের কন্যার বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। গঙ্গাগোবিন্দ গ্রাম মধ্যে অসম্ভ্রান্ত বা সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারও ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে প্রভুত্ব ও সে ক্ষমতা বরদাকান্ত অপেক্ষা অনেক কম। লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বরদাকান্তকে লোকে ভয় করিত, তাঁহার বিপদে লোকে অনিচ্ছায় দুঃখ প্রকাশ করিত। ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে সম্মান করিতে হইত; যে না করিত তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া মান আদায় করা হইত। ভয়ে, নিজ বিপদ উপেক্ষা করিয়াও, বরদার মন যোগাইতে

হইত। গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আন্তরিক, তাঁহার বিপদে লোকে আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইত, সম্পদে আন্তরিক আনন্দিত হইত। কিন্তু অসাধু, ক্ষমতাশালী, অদূরদর্শী জমিদারের বিরাগ-শঙ্কায় প্রজাগণ সতত মনের কথা গোপন করিয়া রাখিত। সেই জন্যই বরদাকান্তের অপেক্ষা গঙ্গাগোবিন্দের ক্ষমতা অনেক কম। রামকুমার সমাজচ্যুত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তৎপ্রতিবিধানার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। জমিদারের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহারও সাহস হইল না। রামকুমার সমাজ-চ্যুত হইয়াই রহিলেন।

যোগেশের সহিত বিমলার বিবাহের আর উচ্চবাচ্য হইল না। মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও গঙ্গাগোবিন্দ নানারূপ অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া অগত্যা বাসনা প্রকাশ করিলেন না; অথচ পুত্রের অন্যত্র বিবাহ দিবারও কোন চেষ্টা করিলেন না। ঘটনাবলী সময়ক্রমে কিরূপে দাঁড়ায় তিনি ধীর ভাবে তাহাই দেখিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রামকুমারও সাহস করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিকট বিবাহের কোন কথা উল্লেখ করিতে পারিলেন না। যদিই বা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলেও কন্যার অন্যত্র বিবাহ দেওয়াও রামকুমারের পক্ষে অসম্ভব হইল। যে বিবাহ করিবে, গ্রামস্থ জনগণের নিকট হইতে পাত্রীর কুল ও বংশাদি বিষয়ক বিশেষ সন্ধান না লইয়া সে কখনই বিবাহ করিবে না। কুল, বংশাদি নিখুঁত হইলেও রামকুমার সমাজ-চ্যুত, তাঁহার কন্যা কে বিবাহ করিবে? বিমলার এত সৌন্দর্য্য, এমন বিদ্যা, এমন শান্তভাব, এত উদারতা, এত প্রসাদ, তাহার পরিণাম কি এই হইল? উপয়াভাবে এইরূপেই দিন কাটিতে লাগিল।

"বিপদ কখন একাকী আইসে না।" এ সত্য যিনি প্রথমে ব্যক্ত করিয়াছিলেন তিনি মানব-জীবন-ক্ষেত্র-সম্ভূত ঘটনা-কলাপের প্রকৃতি সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কলিকাতায় রামকুমারের প্রভু জ্বর বিকার রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রামকুমার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রভুর নিকট আরও কিছু টাকা জমাইয়াছিলেন। অন্তিমকালে প্রভু তৎসমস্ত রামকুমারকে দিলেন।

বিদেশে টাকা কড়ি লইয়া বিব্রত হইতে হইবে ভাবিয়া রামকুমার সঞ্চিত অর্থ সমস্ত গঙ্গাগোবিন্দের নিকট রাখিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—'ভ্রাতঃ! আমার নিকট যে টাকা রাখিলে, তুমি খরচ না পাঠাইলেও তাহার আয়ে তোমার সংসার সুচারুরূপে চলিতে পারিবে।' রামকুমার সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কাল কাহার বাধ্য নহে। সংসারে আমাদের যত গর্ব্ব, যত অহঙ্কার, যত আশা, যত লোভ, সমস্তই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক; মানব সংসার-সমুদ্র-বক্ষ জল-বুদ্বুদ। এই ভাসিতেছে, এই নাচিতেছে—এই নাই। রামকুমারের আয়ুকাল পূর্ণ হইল। প্রভুর মৃত্যুর সপ্তাহদ্বয় পরে রামকুমার, ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইলেন। তিনি অনেকের প্রিয় ছিলেন। অনেকে ব্যথিত হইয়া তাঁহার রোগোপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুই হইল না। তিন দিন পরে রামকুমার স্ত্রী, কন্যা, অর্থ-লিপ্সা, অর্জ্জন-স্পৃহা প্রভৃতি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। আসন্নকালে স্ত্রী কন্যার সহিত রামকুমারের শেষ সাক্ষাৎ হইল না। কয়েক দিন মধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। এই বিপদ-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইল তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ, যোগেশ ও সরমা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ এই বিপদের সময় বিবিধ প্রকারে বিমলা ও তাঁহার জননীর চিত্তে শান্তি ও প্রবোধ বিধান করিতে লাগিলেন। তখন বিমলার বয়স বারো বৎসর। যোগেশের বয়স অষ্টাদশ বর্ষ।

কালে সকলই মন্দীভূত হয়। স্বামী পুত্র বিহীনা অনাথাও কালে হাসে, আশা-ভঙ্গ-জনিত ঘোর মনঃক্লেশ সম্বরণ করিয়া কালে নবীনা প্রেমোন্মত্তা কামিনী পুনরায় আমোদে যোগ দেয়। কালে বিমলা ও তাঁহার জননীর শোক কমিয়া আসিতে লাগিল। রামকুমারের উপার্জ্জিত অর্থের আয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনা ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দের যত্নেও ত্রুটি ছিল না। বিমলা ও তাঁহার গর্ভধারিণীর সন্তোষ সাধনই যোগেশের ব্রতস্বরূপ ছিল।

ক্রমে বিমলা যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যোগেশ রামনগরের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা

অধিক সময় বিমলাদের আবাসে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। চির-সঞ্চিত প্রণয় দৃঢ় হইতে লাগিল। যৌবনাগমে তাহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করিল। যুবক-যুবতী বিবাহের কথা একদিনও ভুলেন নাই। বিবাহ কি তাহা তাঁহারা এক্ষণে সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন। কেন বিবাহ হইতে পারে না, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। ইংরাজি শিক্ষিত ও উন্নতিশীল হওয়ায় যোগেশের চক্ষে বিবাহ বিষয়ে কোনই প্রতিবন্ধক লক্ষিত হইল না। তিনি কৌশলে, পিতার অভিপ্রায় জানিলেন। জানিলেন, দুর্দ্দান্ত পশু-প্রকৃতিক জমিদারের ভয় ব্যতীত তাঁহার অন্য বিশেষ আপত্তি নাই। যোগেশ তাদৃশ জমিদার-ভীত নহেন। যোগেশের বিশ্বাস দেশ অরাজক নহে। আইন আছে, পুলিষ আছে, শাসন আছে; কে কাহার কি করিতে পারে? এক দিন কথা প্রসঙ্গে যোগেশ বিমলার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। বুঝিলেন,—বিমলার কোনই অমত নাই, এবং তাহাই হৃদয়ের একান্ত বাসনা, কেবল তজ্জন্য পরিণামে যোগেশ কষ্ট পাইবেন এই আপত্তি। যোগেশ তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইলেন। বিমলা নীরবে সমস্ত শুনিলেন। যোগেশ ভাবিলেন, বিমলা সমস্ত বুঝিয়া মৌনে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মহানন্দে ভাসমান হইয়া যোগেশ সময়পাত করিতে লাগিলেন। সপ্তাহদ্বয় পরে বিমলা তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। সে পত্র পাঠক মহাশয় দেখিতে পাইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি তোমারই।

সে এ সংসারের কে? যাহার হৃদয়ে মনুষ্য-জীবনের সার সম্পত্তি প্রণয় নাই, সে এ সংসারের কে? প্রণয়, মমতা, আত্মীয়তা, মায়া প্রভৃতি মানব হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তি সমস্ত যাহাতে স্থান পায় নাই, বুঝিতে পারি না, সে এ সংসারের কে? তুমি কন্দ-মূল-কলাশী, বিমল ধবল জটা-কেশ-সমন্বিত মহর্ষি! হইতে পারে তোমার ধর্ম্ম-জ্ঞান অতি নিষ্কলঙ্ক ও তোমার নৈতিক উন্নতি অতি উচ্চ, কিন্তু তুমি এ সংসারের কে? তুমি আসিয়া সংসারের কি অধিক উন্নতি হইল? তোমার জীবন জগতের কি কাজে লাগিল? সংসারের হিতার্থে যাহার জীবনের এক দিনও পর্য্যবসিত হইল না, বিপন্নের বিপদ মোচনার্থ যাহার হৃদয় এক দিনও বিগলিত হইল না, সংসারের অসংখ্যবিধ প্রলোভন সমস্তের একটীও যাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় পাষাণ—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা বিহিত কি না, তাহা বিশেষ বিচার্য্য। ফলতঃ প্রণয়াদি কমনীয় প্রবৃত্তি সমস্ত মনুষ্য-হৃদয়ের ভূষণ। স্বেচ্ছায় সেই ভূষণ সমস্ত পরিশূন্য হওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। যে তাহা করে সে কদাচ প্রশংসনীয় নহে। তোমাকে বিশ্বাস কি? তোমার দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, সৌহৃদ্য নাই, তোমাকে বিশ্বাস কি? কেহ কেহ তোমাকে পরম জিতেন্দ্রিয় ও অতি-শয় ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বরং চৌর বা নরহন্তাকে বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের নায়ক উল্লিখিত রূপ জিতেন্দ্রিয় বা ধার্ম্মিক নহেন। তিনি বিমলার সদিচ্ছা-প্রণোদিত, কিন্তু অসুখ-বিষ-পরিপূর্ণ অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া হৃদয়ের চিরদিনের আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। ভাল বল, মন্দ বল, তাঁহার হৃদয় বিম-লার অনুরোধ শুনিল না। কয়দিনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া

তিনি বিমলা সন্নিধানে গমন করিলেন। পাঠক! এ প্রণয়ী যুগল আপনাদের অনাগত জীবনের কি ব্যবস্থা করিতেছেন শুনি গিয়া চলুন।

বিমলার সেই প্রকোষ্ঠ। বিমলা সেই খট্টায় উপবিষ্টা। যোগেশ দাঁড়াইয়া। উভয়ের দক্ষিণ হস্ত পরস্পর নিবদ্ধ। নিবদ্ধ হস্ত যুগলের উপর বিমলার বদনমণ্ডল। বিমলার নেত্র-নিঃসৃত অশ্রু-বারি হস্ত বহিয়া তাঁহারই বক্ষে পড়িতেছে। বিমলা কাঁদিতেছেন। বহুক্ষণ পরে যোগেশ কহিলেন,—

"বিমলা! আমার যাহাতে ভাল হয় তৎপ্রতি কি আমার দৃষ্টি নাই? স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে আমি কি অন্ধ?"

বিমলা সেইরূপ ভাবেই বলিলেন,—

"আমি তা বলিতেছি না। তোমার বুদ্ধি আমা অপেক্ষা সহস্র-গুণ ভাল। তবে আমি এই জানি যে, ভালবাসায় মনুষ্যকে অন্ধ করে। তুমি আমাকে অপরিমিত ভাল বাস। হয়ত সেই ভালবাসাই তোমাকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করিতেছে।"

যোগেশ বলিলেন,—

"আমি কয়দিন সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়াছি। বুঝিয়াছি তোমা ছাড়া হইয়া রাজপদও আমার পক্ষে অতিশয় অসুখ ও বিষাদময়।"

বিমলা কহিলেন,—

"আমিত ঐ জন্যই বলিতেছিলাম যে, ভাল বাসায় মনুষ্যকে স্বীয় শুভাশুভ সম্বন্ধে অন্ধ করে। ভাল বাসাই তোমাকে অন্ধ করিতেছে।"

যোগেশের মূর্ত্তি গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন,—

"বিমলা! তবে তোমার মত কি? তুমি কি বল, এত আশা, এত ভরসা সমস্তই লয় প্রাপ্ত হউক। স্নেহ মমতা শূন্যে মিশাইয়া যাক্।"

বিমলা নীরব।

যোগেশ ক্ষণেক পরে পুনরায় কহিলেন,—

"যদি তোমার তাহাই অভিপ্রায় হয়—হউক। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তোমার অভিপ্রায়ের বিরোধী কার্য্য করা আমার কদাচ ইচ্ছা নহে। কিন্তু তোমাকেই অনুরোধ করি, তুমিই বল দেখি, তাহা কি সম্ভব?"

বিমলা বলিলেন,—

"উপায় কি ? যোগেশ! তা ছাড়া আর উপায় কি ?"

যোগেশ বিষণ্ণ হাস্য-সহকারে কহিলেন,—

"কি আশ্চর্য্য কথা! উপায় নাই বলিয়া অসম্ভব ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা বাতুলের কার্য্য। আর কেনই বা উপায় নাই বিমলা? আমি তোমাকে বলিতেছি, বিবাহ হইলে আমার কোনই বিপদ হইবে না।"

বিমলা বিপন্নস্বরে ও নিরাশ দৃষ্টি-সহকারে কহিলেন,—

"না না যোগেশ! তুমি ও কথা বলিও না। আমি বিশেষ শুনিয়াছি, এ হতভাগিনীর সহিত বিবাহ হইলে তোমাকে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে।"

যোগেশ বলিলেন,—

"আবার সেই কথা। তবে তোমার পরামর্শ মতে সমস্ত বিস্মৃত হওয়াই শ্রেয়ঃ ?"

বিমলা বিনত মস্তকে বলিলেন,—

"তা পার না, কি ?"

যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—

"তুমি পার ?"

মৃদু সলজ্জ স্বরে বিমলা উত্তর দিলেন,—

"না—হাঁ—কিন্তু কি করিব ?"

যোগেশ প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত নেত্র হইয়া কহিলেন,—

"বিমলা! তুমি যাহা বিস্মৃত হইতে পার না, আমি যে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব, ইহার কারণ কি ?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ ভাবে কহিলেন,—

"তুমি পুরুষ।"

যোগেশ কহিলেন,—

"কোমল কমনীয় কামিনী হৃদয় যাহা সহ্য করিতে পারে না, পুরুষে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা বলে তাহা সহিতে পারে, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু একপ অধ্যাপিন প্রণয় বিস্মৃত হওয়া মনুষ্য সাধ্যের অতীত। যাহা জীবনের সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, দেহের অস্থি

মজ্জার সহিত যাহা বিমিশ্রিত হইয়াছে, শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে রক্তের সহিত যাহা বিচলিত হইতেছে, এরূপ অতি অমূল্য প্রণয়ের কথা বিস্মৃত হওয়া কদাচ মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্যের সাধ্য হইলেও, কদাচ আমার সাধ্য নহে। জ্বলন্ত পাবকে সহাস্যে প্রবেশ করা যায়, অতিপ্রিয় জীবন অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, গরল উদ্গারী সর্পকে স্বেচ্ছায় চুম্বন করা যায়, তথাপি তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার সাধ্যাতীত। তোমার কোন্ দিনের কোন্ কথাটী ভুলিব বিমলা? তোমার আশৈশব জীবনের সমস্ত ব্যাপার যেন অধুনা আমি চিত্রিত পটের ন্যায় সম্মুখে দর্শন করিতেছি; সে সমস্ত কি মধুর, কি সরল, কি আনন্দবিধায়ক। বিমলা, তোমার মনে পড়ে কি না বলিতে পারি না—সেই এক দিন তুমি "মেঘনাদবধ কাব্য" অধ্যয়ন করিতেছিলে। তখন তোমার বয়স নয় বৎসর। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছিলাম। অশোককাননে সীতা ও সরমা কথোপকথন করিতেছিলেন। স্থানটী গ্রন্থমধ্যে অতি মনোরম। আমি অতি অনুরাগের সহিত তোমাকে তাহা বুঝাইতেছিলাম। তুমি অনেকক্ষণাবধি এক মনে আমার অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে। কিন্তু বালিকার চঞ্চল চিত্ত এক বিষয়ে বহুক্ষণ সংযত থাকা সম্ভাবিত নহে। তুমি অন্যমনস্ক হইলে। নিকটে কাঁচি ও কাগজ ছিল। তুমি কাঁচি দিয়া কাগজে ফুল কাটিতে লাগিলে। আমি হস্তস্থিত মেঘনাদ বন্ধ করিয়া তোমার নবনীত নিভ চিবুকে সাদরে একটু কোমল আঘাত করিলাম। তুমি প্রথমে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিলে। পরক্ষণেই বলিলে, "যোগেশ তুমি আমাকে আঘাত করিলে, আমিও তোমাকে আঘাত করিব।" আমি হাসিলাম। তুমি মারিবার জন্য হাত উঠাইলে। আমি তোমার হাত ধরিলাম। তুমি অপর হস্তে মনোরথ সিদ্ধির চেষ্টা করিলে। আমি সে হস্তও ধরিলাম। তুমি হস্তদ্বয় উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট প্রয়াস পাইলে, পারিলে না। আমি আবার হাসিলাম। তোমার বড় লজ্জা হইল। লজ্জায় তোমার বদন-কমল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তুমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলে, "আমার এক অনুরোধ শুনিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "কি অনুরোধ বল।" তুমি বলিলে, "হাত ছাড়িয়া দেও, আমি মারিব।" আমি উচ্চ হাস্য হাসিলাম,

তোমার পবিত্র মুখের পবিত্র ভাব, অসীম সরলতা ও বালিকা ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। বলিলাম, "মার"। হস্ত ছাড়িয়া দিলাম। তুমি মারিবার জন্য হস্তোত্তোলন করিলে কিন্তু মারিতে পারিলে না। হাসিয়া আমার বক্ষমধ্যে বদন লুকাইলে। কি মধুর! কি পবিত্র! জীবন যাইলেও কি এ সমস্ত কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? বিমলা তুমি পাগলিনী।"

বিমলা যেন কিছু লজ্জিত ভাবে বলিলেন,—

"তোমার এতও মনে থাকে?"

যোগেশ বলিলেন,—

"একি ভুলিবার কথা? আরও বলি শুন।"

বিমলা বলিলেন,—

"না, আর বলিয়া কাজ নাই। ও সকল বলিয়া কি সুখ?"

যোগেশ বলিলেন,—

"ও সকল কথায় বিশেষ সুখ আছে, ও সকল স্মরণে যথেষ্ট আনন্দ আছে।"

বিমলা কাজেই নীরব হইলেন। যোগেশ বলিতে লাগিলেন,—

"আর এক দিনের কথা বলি শুন বিমলা। তখন আমি রামনগরে পড়ি। গ্রীষ্মকালের পর যখন বাটী হইতে রামনগর যাই তখন তুমি মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিবার জন্য বলিয়াছিলে। পড়া শুনার ব্যস্ততায় দুই সপ্তাহ তোমাকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। দুই সপ্তাহ পরে বড় মন খারাপ হইয়া উঠিল।—সম্বাদ পাইলাম, তোমার যার পর নাই পীড়া হইয়াছে। ব্যস্ত হইয়া যেখানকার পুস্তক সেই খানেই রাখিয়া বাটী চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম রোগে তোমার ঢুলু ঢুলু বদন বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তোমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।—

বিমলা মধ্যস্থলে বাধা দিয়া কহিলেন,—

"তখন যদি মরিতাম—"

যোগেশ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই কহিলেন,—

"যথাসম্ভব চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু কোনই উপকার হইতেছে না। আমি অতি কষ্টে মনকে দৃঢ় করিয়া তোমার ক্লেশ-নিপীড়িত শয্যা পার্শ্বে

উপবেশন করিলাম। তুমি নয়নোন্মীলন করিয়া আমার প্রতি চাহিলে, চাহিয়াই কহিলে, "ছি! তুমি মিথ্যাবাদী।" অমনি তোমার নয়ন নিমীলিত হইল, অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আর তুমি চক্ষু খুলিলে না। লোকে ভাবিল, তোমার প্রলাপ আরম্ভ হইল। কিন্তু আমি বাক্যের যাথার্থ্য বুঝিলাম। ভাবিলাম আমিই কি তবে বিমলার ব্যাধির কারণ? নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তোমার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরে তুমি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলে আমি সমভাবে বসিয়া কাঁদিতেছি। তুমি বলিলে, "যোগেশ! কাঁদিও না। আমি কঠিন কথা বলিয়াছি। তুমি বলিয়া বলিয়াছি। অন্য হইলে বলিতাম না। আমার পীড়া অনেক উপশম হইয়াছে।" এই বলিয়া তুমি হাসিলে। তোমার বদনে স্বাস্থ্যের চিহ্ন সমস্ত প্রদীপ্ত হইল। আমি রোদন সম্বরণ করিলাম। চিকিৎসক আসিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "অর্দ্ধাধিক রোগ সারিয়াছে।" ঔষধ ব্যবস্থা হইল। আমি তোমাকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে, তুমি হাসিয়া সমস্ত ঔষধ আমার বস্ত্রে ফেলিয়া দিলে। বলিলে,—"ঔষধ যথেষ্ট হইয়াছে।" প্রত্যুত দুই দিনে তোমার রোগ সারিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য প্রণয়! কি পবিত্র, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক স্বভাব! তুমি এই সকল ভুলিতে বলিতেছ। এ সকল কি ভুলিবার কথা বিমলা?"

বিমলার নয়ন দিয়া অশ্রু বিন্দু পড়িতে লাগিল। যোগেশ কহিতে লাগিলেন,—

"তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই পবিত্র মধুরিমাময়। প্রত্যেক কার্য্যই জ্বলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয়-ফলকে লিখিত রহিয়াছে। তাহার কোন্‌টী ফেলিয়া কোন্‌টীর কথা বলিব বিমলা?"

বিমলা গলদশ্রুলোচনে কহিলেন,—

"আর বলিও না যোগেশ, বলিয়া কাজ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—

"কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন বিমলা?"

বিমলা উত্তর দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। যোগেশ বলিলেন,—

"তোমার যাহাতে কষ্ট হয় তাহা করিব না, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু বিমলে! তুমি যে আমার হইবে না এ কষ্ট সহি কি প্রকারে? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ ক্ষতি সহ্য করিয়া এক দিনও জীবন থাকিবে কি?"

বিমলা অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা কহিলেন,—

"যোগেশ! আমি তোমারই, সংসার এক দিকে, আর তুমি এক দিকে। তোমারই সুখের জন্য তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারি, এত পবিত্রতা, এত শ্রেষ্ঠতা, দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী-চরিত্রে থাকা অসম্ভব। অন্যের থাকিলেও আমার তাহা থাকিল না। অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, যোগেশ, প্রিয়তম, আমি তোমা ভিন্ন কাহারও নহি।"

বিমলার বদন মণ্ডল প্রদীপ্ত হইল। লোচন দিয়া রশ্মি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ এত কথা যোগেশকে বলিলাম বলিয়া লজ্জার উদয় হইল। লজ্জায় চারুশীলা বিমলা যেন কোথায় লুকাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। বদন বিনত হইল। যোগেশ হাতে স্বর্গ পাইলেন। ধরণীধাম সুখের নিকেতন বোধ হইল। দেখিলেন যেন ঘর, দ্বার, চারিদিক, হাস্য করিতেছে। সানন্দে বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"প্রাণেশ্বরি! এতক্ষণ আমার সহিত কি তামাসা হচ্ছিল?"

বিমলা কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার বদন লজ্জায় ম্লান হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে যোগেশ বিমলার নিকট হইতে মহানন্দে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবরোধ।

গ্রীষ্ম কালের এই সময়টী কি মনোরম! সূর্য্য ডুবে নাই, কিন্তু ঐ ডুবে। পৃথিবী একটী মনোহর বর্ণে বিমণ্ডিত; রাঙ্গা নয়, স্বর্ণবর্ণ নয়, হরিৎ নয়—একটী মনোহর বর্ণ। আকাশ নির্ম্মল—সাদা আর কালমেঘে পূর্ণ। এক খানি সাদা মেঘ সংসারের রঙ্গ দেখিতে দেখিতে ছুটিতেছে। কিন্তু ঐ যা—মেঘ খানি ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন অংশদ্বয় আর দুই খানি মেঘের সহিত মিলিল। না মিলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। প্রকৃতি সকলকে সতত মিলিতে শিখাইতেছে। জড় মেঘ বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ পরের দেহে নিজ দেহ ঢালিয়া দিল। এ সংসারে মিলনই স্বভাব-সিদ্ধ। যাহা স্বভাব-সিদ্ধ তৎসাধনই সুখ। মিলন জগতের প্রধান সুখ। তুমি মনুষ্য, তুমি সময়ে সময়ে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কর কেন? ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই তোমার সঙ্গে আইসে নাই। তুমি যখন জন্মিয়াছিলে তখন মাতৃগর্ভ হইতেই সম্পত্তি-রাশি সঙ্গে লইয়া আইস নাই। যাহাকে তুমি মূর্খ বা দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছ, তাহার জন্ম-বৃত্তান্তও অবিকল তোমার ন্যায়। জানিও তজ্জন্য কোন প্রভেদ হয় নাই। তবে কেন ধনবান্! তুমি দরিদ্রের সহিত মিলিতে চাহ না? কেন বিদ্বান্! তুমি মূর্খের সহিত সহবাস ইচ্ছা কর না?—মেঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার মেঘের সহিত মিলিল। এইরূপে মেঘ-মণ্ডলী মিলিয়া আকাশে বড় রঙ্গ করিতেছে। এক স্থানে কতকগুলি মেঘ সমবেত হইয়া ভয়ানক রাক্ষসের ন্যায় আকার ধারণ করিতেছে; অপর স্থানে মেঘ সকল মিলিত হইয়া তুষারাবৃত শ্বেত গিরির ন্যায় শোভা প্রদর্শন করিতেছে। ঝির ঝির করিয়া অনতিশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পক্ষী শূন্যে উঠিতেছে, নাচিতেছে, উড়িতেছে, পড়িতেছে। একটী ক্ষুদ্র পক্ষী অনেক দূর উঠিল,—ঐ গেল—অদৃশ্য হইল। উচ্চে উঠিয়া পাখী পাখা ছাড়িয়া দিল—একেবারে

অনেক দূর নামিয়া পড়িল। পাখী বুঝি দেখাইল—অধিক উঠিলে এই-রূপে পড়িতে হয়।

এইরূপ সময়ে বিমলা এক আশৈশব পরিচিতা আত্মীয়ার আলয় হইতে নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অদ্য আত্মীয়া বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে বিমলাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটী লইয়া গিয়াছিলেন। বিমলা সমস্ত দিন আত্মীয়ালয়ে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে বাটী ফিরিতেছেন। এরূপ পল্লিগ্রামে নিতান্ত সম্পন্ন না হইলে, লোক জন সঙ্গে লইয়া বা যানাদি আরোহণে গমনাগমনের প্রথা নাই। বিমলা একাকিনী আসিতেছেন। একাকিনী বলিয়া কিছু ভীতি ও ব্যস্ততা সহ চলিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। বিমলাও প্রায় নিজালয় সন্নিহিত হইলেন। এমন সময় সহসা পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভবন হইতে শব্দ হইল,—

"বিমলা! একবার আমাদের বাটীতে এসো।"

স্বর নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত। যে বাটী হইতে শব্দ সমুত্থিত হইল তাহা সুশীলা নাম্নী বিমলার ক্রীড়া-সহচরীর আলয়। সুশীলা ধনীর কন্যা। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে ও অদৃষ্ট-চক্রে নিদারুণ দীনতা তাহাদিগকে বিদলিত করিতেছে। সুশীলা পিতৃহীনা। তাহার জননী এক সুপাত্র সন্ধান করিয়া তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতা কন্যা-সহ অন্য উপায়াভাবে জামাতৃ-গৃহে বাস করিতেন। কখন কদাচিৎ অবন্তীপুর আসিয়া আপনাদের জীর্ণ ভবন দেখিয়া যাইতেন। ইদানীং তাহারা অনেক দিন এখানে আইসেন নাই। বিমলা আহ্বান শব্দ শ্রবণে অনুমান করিলেন, হয়ত সুশীলা ও তাঁহার মাতা আসিয়াছেন। মনে বড় আনন্দ হইল। বিমলা ব্যস্ততা সহ প্রবেশ দ্বার দিয়া ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যাকাল, তাহাতে মন সুশীলার দর্শনাশায় উল্লসিত, সুতরাং বিমলা অন্য কিছুই লক্ষ্য করিলেন না; নচেৎ তিনি বুঝিতে পারিতেন, ভবনে জন সমাবেশের কোনই লক্ষণ নাই। যাহাই হউক বিমলা ভবন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন.—তথায়ও কেহ নাই তো!

বিমলা সভয়ে বলিলেন,—

"তোমরা কোথা গা?"

প্রান্তের এক প্রকোষ্ঠ হইতে শব্দ হইল,—

"এ দিকের ঘরে।"

বিমলা সেই দিকে চলিলেন।

প্রকোষ্ঠগুলির অবস্থা অতি ভয়ানক। জীর্ণ, অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন। ভিত্তির ইষ্টক সমস্ত শ্বেতাবরণাচ্ছাদিত নহে। তাহাও লোণা ধরিয়া বিকৃত দশা প্রাপ্ত। তলদেশ বন্ধুর ও অপরিষ্কার। স্থানে স্থানে স্তূপাকার ইঁদুরের মাটি। অধিকাংশ জানালা ও দ্বারের কপাট শীত-বাতাতপ সহ্য করিয়া চরমে নিকটস্থ কোন গৃহস্থের চুল্লী মধ্যে দেহ-সমর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধিত করিয়াছে। ফলতঃ রাত্রি কালে বিনা আলোকে তন্মধ্য দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য। বিমলা কিয়দ্দূর গিয়া আর যাইতে পারিলেন না। বলিলেন,—

"তোমরা কি প্রদীপ জ্বাল নি? যাই কেমন করে?"

প্রান্তের প্রকোষ্ঠ হইতে পুনরায় শব্দ হইল,—

"যে বিপদ মা! কিছুই মনে নাই।"

বিপদের কথা শুনিয়া বিমলার মনে হইল, সুশীলা বুঝি পীড়িতা হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি এতক্ষণ স্বয়ং আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। বিমলা সমস্ত প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করিয়া অতিকষ্টে যথাস্থানোদ্দেশে চলিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"কোন্ ঘরে গা?"

সম্মুখের প্রকোষ্ঠ হইতে উত্তর আসিল,—

"এই ঘরে।"

বিমলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কেহই নাই। বিমলার মনে বড় ভয় হইল। বলিলেন,—

"হাঁ গা, কোন্ ঘরে গা?"

কোনই উত্তর হইল না। কিন্তু সহসা গৃহের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ হইয়া গেল। বিমলা দারুণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে সাহস দিল না। অপেক্ষাকৃত স্থির হইয়া বিমলা রুদ্ধ-দ্বার উন্মোচনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—পারিলেন না। অধিক কাতর ভাবে ভীতি-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"কে আছ, আমাকে দ্বার খুলিয়া দেও।"

উত্তর নাই। কাকুতি মিনতি করিলেন, তথাপি উত্তর নাই। বিমলা উৎকণ্ঠা হেতু স্রোতস্বিনী মধ্যগত তৃণখণ্ডের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার, অপবিত্রকৃত প্রকোষ্ঠের মধ্যে পারাবত, চর্ম্মচটিকা ও মুষিকের পুরীষ রাশির উপর বিমলা উপবেশন করিলেন। লোচন যুগল দিয়া অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিমলা সেই অবরোধে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কে জানে বিমলার অদৃষ্টে কি আছে? ভবিষ্যতের গূঢ়তম প্রদেশের ঘটনাবলী কে বলিতে পারে? যে পারে নিশ্চয়ই সে মনুষ্য অপেক্ষা উর্দ্ধ জীব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাষাণ ও কুসুম।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে অবন্তীপুরের জমিদার বরদাকান্ত রায়ের অন্তঃপুরের একতম প্রকোষ্ঠ মধ্যে যুবক যুবতী রহিয়াছেন। যুবক—জমিদার বরদাকান্তের একমাত্র পুত্র, তাঁহার নাম রুদ্রকান্ত। যুবতী—তাঁহারই পত্নী, নাম মালতী। কমলার সহিত বাগ্দেবীর বিসম্বাদ চির প্রচলিত কথা;—রুদ্রকান্তের লক্ষ্মী শ্রী আছে, সুতরাং তিনি ঘোর মূর্খ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় মূর্খতা তাদৃশ দোষের কথা নহে। কারণ অভিনব সভ্যতার প্রণালীতে মূর্খতাকে আবরিত করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। রুদ্রকান্ত সে সকল উপায় সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন না, তথাপি যতটুকু জানিতেন তাহাতেও, কোন ক্রমেই তাঁহাকে, মূর্খ বলা যাইতে পারে না। কারণ যথোচিত বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন,

তজ্জন্য তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী সভ্যতা ও বিদ্যা উভয়ই বাড়িয়াছে। সেই সময় হইতেই তিনি অপরিমিত সুরা সেবন করিতে শিখিয়াছেন, কেশরাশিতে গন্ধদ্রব্য দিয়া তিন স্থানে সিঁথী কাটিতে শিখিয়াছেন, গণ্ডস্থলে নবোদ্ভূত শ্মশ্রুরাজি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নেত্রদ্বয় চসমা সমাচ্ছন্ন করিতে শিখিয়াছেন এবং চুরোটের ধূম সেবন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন। তবে তিনি মূর্খ কিসে? বাস্তবিক তিনি যে ইংরাজী শিখেন নাই, এমন বোধ হয় না। কারণ তিনি দ্বারবান্, চাকর প্রভৃতির সহিত কথা কহিতে হইলে ইংরাজি-ব্যবহার করিতেন এবং পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রেই "গুড্মর্নিং" বলিতেন, "সেক্‌হেণ্ড" করিতে যাইতেন, ও বিরক্ত হইলে "ইষ্টুপিট্" বলিয়া গালি দিতেন। লেখা পড়ার কথা উঠিলে, যদি সহজে পলায়ন করিবার উপায় না পাইতেন, তাহা হইলে অনায়াসে "হামিণ্টন্স প্যারাডাইজলষ্ট্" "গোল্ডস্মিথস্ স্পেক্টটর" প্রভৃতি পুস্তকের বাদানুবাদ করিতেন। সুতরাং বোধ হয় ইংরাজি ভাষায় তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার সভ্যতা সম্মত নীতি শিক্ষা হয় নাই এমন নয়। কলিকাতায় অবস্থান কালে রুদ্রকান্ত সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন। তদ্ধেতু তিনি "স্ত্রী স্বাধীনতা", "ভ্রাতৃভাব", "প্রেম" প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় শব্দই অভ্যাস করিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে কি করিতে বল? তাঁহার ত্রুটী কি? পাঠক! এ হেন ব্যক্তিকেও যদি আপনি মূর্খ বা অসভ্য বলেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার বুঝিবার ভুল!

পিতা মাতার নিকট রুদ্রকান্তের আদরের সীমা নাই। তাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের ছেলের মত ব্যক্তি এই "বিশ্ব বাঙ্গালায়" আর কখন-জন্মে নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, রুদ্রকান্ত কালেজের "ঔট্"। সুতরাং আনন্দ ও গর্ব্বের সীমা নাই। সে যাহাই হউক, এই আশ্চর্য্য জীবের দৌরাত্ম্যে অবন্তীপুর তোলপাড়, তথাকার লোক সমস্ত অস্থির ও জ্বালাতন!

মালতীর প্রকৃতি সর্ব্বথা রুদ্রকান্তের বিপরীত। তিনি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র-তনয়া। কলিকাতা সন্নিহিত কোন্নগরে তাঁহার পিত্রালয়। পিতা মাতার যত্নে মালতী যে লেখা পড়া শিখিয়াছেন, "কালেজের ঔট্" রুদ্র-

কান্তের হাতে না পড়িলে, তাহা বিশেষ গৌরবের হইত সন্দেহ নাই। স্বামীকে অন্তরের সহিত ভক্তি করা যে স্ত্রীর পরম ধর্ম্ম, মালতী তাহা বিশিষ্ট রূপে জানিতেন। এজন্য রুদ্রকান্তের স্বভাব যৎপরোনাস্তি কলুষিত জানিয়াও মালতী কদাচ তাঁহাকে ঘৃণা বা অবহেলা করিতেন না, বরং যাহাতে রুদ্রকান্তের স্বভাব সংশোধিত হয়, মালতী কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিতেন। রুদ্রকান্ত মালতীকে দুই চক্ষের বিষ দেখিতেন। মালতীর সহিত কিয়ৎকাল সহবাস করিতে হইলে তিনি ঘোর বিপদ ও যাতনা বোধ করিতেন। স্বামীর বিরাগভাজন হওয়া অপেক্ষা রমণী জীবনে আর অধিক শাস্তি কিছুই হইতে পারে না। সুশীলা মালতীর ক্লেশের সীমা ছিল না। অন্ন, বস্ত্র, দাস, দাসী কিছুরই অভাব ছিল না, সত্য, কিন্তু রমণী জীবনের সার সম্পত্তি স্বামী-প্রেম কেমন অমূল্য সামগ্রী তাহা তিনি কখন জানিতে পারিলেন না। এ ঘোর মর্ম্মবেদনার কে প্রতিবিধান করিবে? কে, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার স্বামীর চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিবে? পল্লিগ্রামের জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।' রুদ্রকান্ত একটী ছোট খাট সিরাজ উদ্দৌলা। কাহার সাধ্য তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কয়? প্রজাগণ নীরবে রুদ্রকান্তের উৎপাত সহ্য করিত। উপায় নাই। যদি জনরব এবম্বিধ কঠিন শাসন সমস্ত লঙ্ঘন করিয়া কখন পুত্রের কোন নিন্দার কথা পিতার কর্ণে বহন করিত, তিনি তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিতেন,—"যৌবনে এ দোষ অপরিহার্য্য।" সুতরাং মালতীর ক্লেশ অপ্রতিবিধেয়।

মালতী পরমাসুন্দরী। তাঁহার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। ছয় বৎসর কালে তিনি স্বুবর্ণ পিঞ্জরের পক্ষিণীর ন্যায় রুদ্রকান্তের অবরোধ নিরুদ্ধা। ইতিমধ্যে এক দিনও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণ পবিত্র সম্বোধনে সম্ভাষিত করেন নাই। সে ত দূরের কথা—ঘৃণাসূচক কথা ও অভদ্র জনোচিত ব্যবহার ভিন্ন তিনি কদাচ ভদ্র ব্যবহার করেন নাই। মালতীর এ অসুলভ সৌন্দর্য্য, পবিত্র সরলতা, স্বাভাবিক বিনয়, অসাধারণ শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্গুণ সমস্তই ভস্মে ঘৃত হইল! দিবাকর চিরমেঘাচ্ছন্ন রহিল—এ বিমল কমলকে প্রফুল্ল করিল না; পৌর্ণমাসী শশধর জলদ পটল সমাচ্ছন্ন হইল—চকোরিণী আনন্দ পাইল না;

প্রচণ্ড ঝ্যাভা কাক চক্ষু সন্নিভ মেঘরাশি অপসারিত করিল—তৃষিতা চাতকিনী বারি-ধারা পাইল না। এ কুসুমের অনুপম শোভা যে দেখিবার সে দেখিল না;—ইহার সন্তোষ সংশাধক সৌরভ যে সম্ভোগ করিবার সে সম্ভোগ করিল না। আশ্রয়-তরুর শাখা নাই, এ লতিকা কিরূপে শোভা বিকাশ করে? মালতীর দুঃখের সীমা নাই।

অদ্য মালতীর পরম সৌভাগ্য! রুদ্রকান্ত অদ্য তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছেন। ভুলিয়া আসেন নাই, তাহা হইলে আসিবা মাত্র চলিয়া যাইতেন। না—ভুলিয়া আসেন নাই। মালতীর পর্য্যঙ্কে রুদ্রকান্ত উপবিষ্ট। মালতী সভয়ে, অবনত মস্তকে, অথচ সানন্দিত ভাবে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া।

মালতী ধীরে ধীরে মধুর স্বরে কহিলেন,-

"আজ যে দাসীর প্রতি বড় অনুগ্রহ।

রুদ্রকান্ত রুক্ষভাবে বলিলেন,—

"আমার দরকার আছে।"

মালতী কহিলেন,—

"হতভাগিনীর অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হবে যে, তুমি বিনা প্রয়োজনেও আমার নিকট আসিবে? যাহাই হউক আমার নিকট যে তোমার কোন দরকার পড়িয়াছে, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।"

মালতী যাহা বলিলেন, রুদ্রকান্তের শ্রুতি যুগলে তাহা প্রবেশ লাভ করে নাই; তাঁহার মন অন্যদিকে ছিল। কহিলেন,—

"ওহো! আমার বরাত আছে, শীঘ্র যাইতে হইবে।"

মালতী বলিলেন,—

"যদি দয়া করে এসেছ, একটু ব'স। দাসীর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে না।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"আমার এত সময় নাই যে, তোমার সঙ্গে এখানে বসে বৃথা সময় কাটাই।"

মালতী বলিলেন,—

"ভাল, তোমার যদি কাজ থাকে, কি সময় না থাকে, তা হলে

আমি এমন বলি না যে, তুমি সব বন্ধ করে আমার কাছে থাক। তবে পথ ভুলে এসেছ যদি--"

রুদ্রকান্ত রাগত স্বরে বলিলেন,—

"আঃ! আমি তোর নাকে কান্না শুন্তে আসি নাই। জ্বালাতন করিস্ না।"

মালতীর চক্ষে জল আসিল। কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—

"তুমিই তো আমাকে কাঁদাচ্চ। এ কান্না তুমি না শুন্‌লে কে শুন্‌বে?"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"আমার এত দায় নাই। আমি ঢের শাস্ত্র পড়েছি। স্ত্রীর কাছে দিবারাত্রি বসে থাক্‌তে হবে, এমন কোন শাস্ত্রে লেখে না।"

মালতী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—

"তা লেখে না, কিন্তু স্ত্রীকে সতত কাঁদাতে হবে এমন ব্যবস্থা লিখেছে কি?"

মহাবিরক্তির সহিত রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"ভাল জ্বালা! কে তোরে ধরে মার্‌ছে, যে তুই কাঁদ্‌ছিস্?"

মালতী সজলনয়নে কহিলেন,—

"এ কষ্টের চেয়ে মারা ভাল।"

রুদ্রকান্ত অত্যন্ত কর্কশ ভাবে কহিলেন,—

"কষ্ট টা কি? যে তোর বিদ্যা না জানে তার কাছে গিয়ে কষ্টের কথা বলে কাঁদিস্, তার দয়া হবে। আমি সব জানি; তোর বাপ্ বেটা মহা পাঁপুরে। তার বাপের জন্মে লক্ষ্মীর সংস্থান নাই। আমি যেই তোরে দয়া করে বিয়ে করেছি সেই তোর এত সুখ। তাই এত গহনা, ভাল কাপড়, চাকর, নফর, সুখের সীমা নাই, এততেও তোমার কষ্ট। ওরে আমার কষ্ট রে! এতেও যদি মন না উঠে, তবে না হয় বাপের বাড়ী গিয়ে ঘুঁটে কুঁড়িয়ে খাওগে।"

মালতীর চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত মহা বিরাগের সহিত কহিলেন,—

"আমি এলেম ওঁর কাছে, তা ভাগ্য বসে মানা নেই, আবার উপরন্তু কান্না! থাক্ তোর কান্না নিয়ে,—আমি চল্লেম।"

বদনোন্মুক্ত করিয়া মালতী দেখিলেন, রুদ্রকান্ত যথার্থই চলিয়া গিয়াছেন। সরলা, অভিমান-প্রবণ-হৃদয়া মালতী যথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তথায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কে তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবে? কে তাঁহার মর্ম্মবেদনা বুঝিবে?

রুদ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। পাষাণ সহজে অঙ্কিত হয় না। রুদ্রকান্তের হৃদয়ে মালতীর রোদন-জন্য অঙ্কপাত হইল না। তিনি আবার ফিরিয়া মালতীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন,—

"যে দৌরাত্ম্য—এখানে এসে তো কাজের কথা হবার উপায় নাই। আমি যা জিজ্ঞাসা করি আগে তার উত্তর দে, তারপর সারাদিন বসে কাঁদিস্।"

মালতী বস্ত্রাঞ্চল অপসারিত করিলেন,—দেখিলেন রুদ্রকান্তের মূর্ত্তি আরও রুদ্র। আবার বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া মালতী রোদন করিতে লাগিলেন। রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"আস্পর্দ্ধা দেখ। যদি ভাল চাস্, তবে আমি যা বলি শোন্।"

মালতী সেই ভাবেই বলিলেন,—

"বল।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"এক স্যুট গহনার আমার আজ্ এখনই দরকার। তোর গহনা আমাকে এখনই দে।"

মালতী কহিলেন,—

"গহনায় আমার কোন দরকার নাই। তুমি এখনই সব অলঙ্কার নিয়ে যাও।"

এই বলিয়া চাবির রিং ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। রিং মধ্যে অনেকগুলি চাবি ছিল। ব্যস্ত, অস্থির প্রকৃতি রুদ্রকান্ত বাক্সের যথার্থ চাবি না লাগাইয়া অপর চাবি লাগাইলেন। বাক্স খুলিল না। জড় প্রকৃতি সম্পত্তির বাধ্য নহে, সে সামান্য জ্ঞান তাঁহার নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন বাক্স, চাবি, রিং সকলই তাঁহার পিতার জমিদারির

প্রজা। আর একটী চাবি লাগাইলেন। তাহাতেও হইল না। এরূপে কয়েকটী অযথার্থ চাবি দিয়া বাক্স খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। এক সঙ্গে বাক্স, চাবি ও মালতী তিনেরই উপর তাঁহার ভয়ানক রাগ জন্মিল। দেহে যত শক্তি আছে, একটী অন্য চাবি লাগাইয়া, তাহার উপর সেই সমস্ত প্রয়োগ করিলেন। বাক্সের কলটী একেবারে খারাপ হইয়া গেল। না ভাঙ্গিলে খুলিবার আশা রহিল না। রুদ্রকান্তের অসহ্য ক্রোধ জন্মিল। তিনি বাক্সের উপর "ড্যাম" বলিয়া এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। বাক্সের কাঠ মজবুত ছিল—ভাঙ্গিল না। সাহেবের মধ্যে হস্তে ভয়ানক আঘাত লাগিল। আরও রাগ হইল।

এই সময়ে মালতী বলিলেন,—

"বাক্সের ঠিক চাবি লাগান হয় নাই।"

রুদ্রকান্ত বাক্স হস্তে লইয়া মালতী সন্নিধানে আসিয়া উগ্র ভাবে কহিলেন,—

"কি আমার সহিত তামাসা? গহনা দিবার মতলব নাই; তাই অন্য চাবি দিয়া আমাকে এইরূপ কষ্ট দিয়াছিস্। গহনা কি তোর বাবার যে তুই দিবি না? দাঁড়া তুই—"

এই বলিয়া পাষণ্ড, নৃশংস, রুদ্রকান্ত মালতীর নবনীত-নিভ সুকোমল সুন্দর বদনে তিন চারি পদাঘাত করিয়া বাক্স হস্তে প্রস্থান করিলেন!!! মালতী ধরাবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পাদুকার আঘাতে বদনের স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। সেই সকল ক্ষতমুখ প্রবাহিত রুধির ধারায় মালতীর অনুপম বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল!!! অদৃষ্ট।

যদি আমাদের সমাজের যাবতীয় নিয়ম অতি সুব্যবস্থা ও বিজ্ঞতার সহিত নির্ব্বাচিত হইয়াছে স্বীকার করা যায়, যদি আমাদের ধর্ম্ম প্রণালী, রীতি, নীতি সমস্তই নিরতিশয় উচ্চ সভ্যতার আদর্শ স্থল বলিয়া গ্রাহ্য করা যায়; যদি আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি ভূতলস্থ সমস্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়; তথাপি আমাদের পরিণয় সম্বন্ধীয় ঘোর অদূরদৃষ্ট, অবিমৃষ্য, নৃশংস নিয়ম চিরদিন আমাদের জাতীয় কলঙ্ক স্বরূপ থাকিবে। জাতীয় ইতিহাস অনন্তকাল এই নৃশংস কাহিনী জন-সমাজে প্রচারিত করিবে,

তাহার পৃষ্ঠ হইতে ইহা অপসারিত হইবে না। এ ঘোর শোকাবহ অত্যাচার আর কিছুতেই লুক্কায়িত রহিবে না। এই জঘন্য নিয়ম নিবন্ধন নিয়ত আমাদের সমাজ-কুসুমে অসততা কীট বাস করে, এই জন্যই অতুলনীয়া বঙ্গ সীমন্তিনীগণ পবিত্র মানবজন্ম পশুবৎ অতিবাহিত করে, এই জন্যই স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দ বঙ্গীয় পরিবার মধ্যে স্থান পায় না, এই জন্যই পবিত্র প্রণয়রূপ পরম সুখ বঙ্গীয় হৃদয়ে কদাচ প্রবেশ করে না, এই জন্যই নিত্য নিত্য শত শত নর নারী স্ব স্ব স্বর্গীয় সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া পাপের পঙ্কিল হ্রদে প্রবেশ করে। এই ভয়ানক কঠোর সমাজ শাসন হইতে অহরহঃ বঙ্গদেশে যে কত শত অভিনব অনর্থপাত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কে জানে কত দিনে বঙ্গীয় সমাজ-হইতে এই নিষ্ঠুর নিয়ম বিদূরিত হইবে? কে জানে কত কালে বঙ্গ-পরিবার সন্তোষ, আনন্দ ও সুখের নিলয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে? উচ্চ-শিক্ষাই দেশের প্রকৃত উন্নতির লক্ষণ নয়, দীর্ঘ উপাধিসমূহও উন্নতির কারণ নয়, অথবা আমরা যে কিছু লইয়া গৌরব করি তৎসমস্তও প্রকৃত উন্নতি নয়। প্রকৃত উন্নতি সামাজিক সুব্যবস্থার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। তৎ-সাধনে যত্নশীল হও উন্নতি লাভ করিবে, নচেৎ দেখিতে মনোরঞ্জন হই-লেও পূর্ণ-বিকসিত পলাস-কুসুমবৎ, এ উন্নতি অন্তঃসারবিহীন হইয়া থাকিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

তিন দিন বিমলার উদ্দেশ নাই। সহসা তিনি কোথায় গেলেন বা তাঁহার কি হইল তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। আত্মীয়বর্গ ঘোর চিন্তায় আকুল। তাঁহার জননীর যে অবস্থা তাহা বর্ণনা করিয়া কি বুঝাইব? বিমলার বাটী অন্ধকার। বিমলার পরিষ্কার প্রকোষ্ঠ ধূলি-জঞ্জালে সমাচ্ছন্ন। তাঁহার পুস্তক সমস্ত অব্যবস্থিত।

অতি প্রত্যূষে যোগেশ স্বীয় নিবাসালয় সন্নিধানে পদব্রজে বেড়াইতে বেড়াইতে বায়ু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, ঘোর চিন্তায় আকুল, আকৃতি শ্রীভ্রষ্ট, লোচন-যুগল অস্থির, বদনে কালিমা; আহার ও নিদ্রার অন্যথায় দেহ বিশীর্ণ।

সময়টী অতি মনোহর। বৃক্ষপত্র কাঁপাইতে কাঁপাইতে, বিলম্বিত ফল দুলাইতে দুলাইতে, বনলতিকা নাচাইতে নাচাইতে, অল্প অল্প শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পথ পার্শ্বস্থ গুল্ম সমস্ত শিশিরাবরণে আবরিত রহিয়াছে। এখনও প্রকৃতি নীরব। কেবল সময়ে সময়ে এক এক জন "তারা দুর্গতিনাশিনী মাগো" বলিয়া সুপ্তোত্থিত হইতেছে। এক বৃদ্ধ উঠিয়া ঘরের দাবায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, কাশিতেছে, সময়ে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিতেছে, তুড়ি দিতেছে ও দুর্গা নাম উচ্চারণ করিতেছে। দুইটী কুকুর খেলা করিতেছে। একটী ছুটিতেছে, আর একটী তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। নিকটস্থ হইয়া উভয়ে উভয়কে কামড়াইতেছে, উল্লম্ফন করিতেছে, একটী পড়িতেছে, আবার ছুটিতেছে আবার নিকটস্থ হইতেছে। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিল। পার্শ্বস্থ আম্র বৃক্ষ হইতে সপ্তস্বর নিনাদী মধুময় কণ্ঠে পাপিয়া "চোখ্ গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রধাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য দেখা দিলেন। বৃক্ষ, গৃহ, দ্বার, বন সমস্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

চিন্তাকুল-চিত্ত যোগেশ আপন মনে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন। অস্থির চিত্তের নিয়মানুসারে যোগেশ পরিক্রমণ করিতেছেন,—তাহার সীমা নাই। কখন বা একটু দূরে গিয়া পড়িতেছেন; কখন বা মধ্য পথ হইতে বিপরীত দিকে ফিরিতেছেন। পশ্চাতে কোন শব্দ হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি তাঁহাকে ডাকিতেছে। পার্শ্বে কোন অব্যক্ত ধ্বনি হইতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, কে বুঝি কাঁদিতেছে। যোগেশ এইরূপ নিদারুণ চঞ্চল চিত্তে পরিভ্রমণ করিতেছেন,—কখন বা বিনা প্রয়োজনে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন। যোগেশ যখন এবম্বিধ অবস্থায় অবস্থাপিত, সেই সময় একজন লোক তাঁহার নিকটস্থ হইল। যোগেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। লোক বিশেষ নিকটস্থ হইল। যোগেশের সে দিকে লক্ষ্যও নাই—মনোযোগও নাই। লোক নিকটস্থ হইয়া বুঝিল, যোগেশ বাবুর মনের অবস্থা ভাল নাই। আগন্তুক "হাঃ হাঃ" শব্দে হাসিয়া উঠিল। যোগেশ চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন—দেখিলেন, ব্যক্তিটা রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী অতি ব্যঙ্গ ব্যঞ্জক বিকট হাস্য সহকারে কহিল,—

"হাঃ হাঃ, কেও যোগেশ বাবু যে, হাঃ হাঃ"—

যোগেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মহাশয়! অতি প্রত্যূষে কোথায় গমন কচ্চেন ?'

রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন,—

"যাব আর কোথা, মহাশয়ের নিকটেই আসা।"

যোগেশ অপেক্ষাকৃত বিস্ময় সহকারে কহিলেন,—

"আমারই নিকটে ? আসুন বাটী গিয়া বসি চলুন।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"এখন বসিবার সময় নয় বাবু। আমাদের আজি কালি পাথরে পাঁচ কীল বাবা। বুঝেছ, যেখানে ছুঁই না চলে আমরা সেখানে বেটে চালাই। বাবা আমাদের আঁটে কে ?"

যোগেশ ভদ্রতা সহকারে কহিলেন,—

"যদি বসিবার সময় না থাকে তবে কি অভিপ্রায়ে আসা বলুন।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"অভিপ্রায় এমন কিছু নয়। রুদ্রকান্ত বাবাজীর তোমার সহিত কি দরকার আছে ; একবার যেতে পার্‌বে কি ?"

যোগেশ বিনীত ভাবে বলিলেন,—

"তা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"চেষ্টা ? চেষ্টা কেন হে ? তুমি এতই কি কাজের লোক ? যাবেই বল না কেন। তা যাক্ মরুকগে—তোমাকে কেমন কেমন দেখ্‌ছি কেন ?"

নিতান্ত অনিচ্ছায় যোগেশ উত্তর দিলেন,—

"আজ্ঞে হাঁ, আমার মনটা একটু চিন্তিত আছে।"

আবার রামকৃষ্ণ বিজাতীয় বিদ্রূপ স্বরে কহিলেন,—

"চিন্তিত ? কেন ? ওহো ! বুঝেছি বুঝেছি। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল বলে বুঝি। তা যা হউক, তোমার কাছে খাটী খবর পাব। বলি বিমলা নাকি বেরিয়ে গেছে ?"

যোগেশের লোচন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন,—

"তোমাকে মানুষ বলিয়া বোধ করি না, তাই তুমি বাঁচিয়া গেলে। যাও, তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"তা তো বল্‌বেই জানি। এখনই এই, ইহার পরে না জানি আরও কত হবে। বড় আঁতে ঘা লেগেছে বাবা।"

আর কোন কথা না বলিয়া রামকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। যোগেশ অব্যবস্থিত ভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত ভয়ানক অস্থির হইল। রামকৃষ্ণের তীব্র বিদ্রূপ, তাহার কথার ভঙ্গী, অকারণে অসময়ে তাহার সমীপে তাঁহার আগমন, প্রভৃতি নানা চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তাঁহার মন বিজাতীয় আশঙ্কা ও সন্দেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ কি মনে হইল, সত্বর বাটী আসিবার নিমিত্ত পুনরাবর্ত্তন করিলেন। সহসা একটী পরিচিতা প্রতিবেশিনী বালিকা তাঁহার নিকটে আসিল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন না। দেখিলেন—

কিন্তু সে দেখা শূন্য দৃষ্টি। বালিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া যোগেশ চলিয়া গেলেন। বালিকা তখন সঙ্কুচিত ভাবে ডাকিল,—

"দাদা—"

যোগেশ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া বালিকার বদনের প্রতি কঠোর দৃষ্টি-পাত করিলেন। বালিকা ভীতা হইয়া, যাহা বলিবে তাহা ভুলিয়া গেল। ক্ষণপরে মন স্থির করিয়া কোমল স্বরে যোগেশ জিজ্ঞাসিলেন,—

"কুসুম! কোথা যাচ্ছ?"

কুসুমের এখন সাহস হইল। বলিল,—

"দাদা তোমার এই চিঠি।"

যোগেশ কুসুমের হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন,— শিরোনামে তাঁহারই নাম লেখা। পত্র তাঁহারই বটে। লেখাটী যেন স্ত্রীলোকের লেখার মত। হস্ত বিকম্পিত হইল। মন অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যস্ততা সহ যোগেশ পত্রিকা উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এই কয়টী কথা লিখিত ছিল।

"বিমলা রুদ্রকান্ত বাবুর চাতুরীতে অবরুদ্ধা হইয়াছে। কোথায় আছেন জানি না। আপনারা তাঁহার জন্য ঘোর চিন্তিত বলিয়া যাহা জানিতাম তাহা জানাইলাম। অনুসন্ধান করিলে সহজে সন্ধান পাই-বেন। হতাশ হইবেন না।

"পত্র খানি পড়িয়া ছিন্ন করিবেন নচেৎ আমার বড় বিপদ হইবে।

"যিনি এই কার্য্যের মূল, তাঁহার নাম আপনাকে জানাইলাম। অনুরোধ করি তাঁহাকে বিপদাপন্ন বা অপমানিত করিবার চেষ্টা করিবেন না।

"আমি কে তাহা জানিয়া কাজ নাই। ইতি"

পত্রে তারিখ নাই। লেখকের নামও নাই। যোগেশ পত্র পড়িয়া বাতুলের ন্যায় অস্থির হইলেন। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন রামকৃষ্ণের বিদ্রূপোক্তি, তাহার আগমন প্রভৃতির কারণ তিনি বেশ প্রণিধান করিলেন এবং রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ যে এই সর্ব্বনাশের মূল তাহাও তিনি এখন বেশ বুঝিতে পারিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যোগেশ প্রথমতঃ অজ্ঞাত লেখকের অনুরোধানুসারে পত্র খানি খণ্ড খণ্ড

করিয়া ফেলিলেন। কুসুম ভাবিল, পত্রখানি দিয়া সে বুঝি কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। সে ভয়ে, এক দৌড়ে যোগেশের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। যোগেশ তাহাকে আরও কি জিজ্ঞাসিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরিণাম।

যোগেশ ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিলেন, তথায় আসিয়া পিতাকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন। বিমলার মাতাকে এত কথা জানাইবার ইচ্ছা ছিলনা। তথাপি তিনিও অনেক কথা জ্ঞাত হইলেন।

রুদ্রকান্ত কর্ত্তৃক এই ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে শুনিয়া গঙ্গাগোবিন্দ অবাক হইলেন। মনে ভয়ানক ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ বা বল প্রয়োগে কোন ইষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর অনিষ্টই সংঘটিত হইবে বিবেচনায় ক্রোধ প্রশমিত করিলেন। তাহার পর নিঃসংশয়ে স্থির হইল, বিমলা অবন্তীপুরে নাই। তাঁহাকে রুদ্রকান্ত কোন স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সে স্থান কোথায়, কেহ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যোগেশ বলিলেন,—

"যখন অবন্তীপুরে বিমলা নাই, তখন ইহা একরূপ স্থির হইতেছে যে, যে কয় স্থানে বরদাকান্তের জমিদারী বা কুঠী আছে, তাহারই কোন না কোন স্থানে অবশ্যই বিমলা আছেন। সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই বিমলার সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং তাঁহাকে উদ্ধার করা যাইবে।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"অনুমান যথার্থ বটে, কিন্তু সে স্থান সকলের অনুসন্ধান করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে।"

যোগেশ বলিলেন,—

"এ বিপদের পরিমাণে সমস্তই সহজ।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—

"ভাল, সে সন্ধান পাইলেও বিমলাকে উদ্ধার করা সহজ হইবে না।"

যোগেশ বলিলেন,—

"আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি অদ্য রামনগরে গিয়া পুলিসে সমস্ত জানাইব। পুলিসের সাহায্যে সমস্তই সহজ হইবে। অবন্তীপুরেই বরদাকান্ত রায় বড় বলবান। এবার তাহার বল বিক্রম তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।"

গঙ্গাগোবিন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"তাহাই ভাল। তুমি অদ্যই রামনগর যাত্রা কর। তথায় কেশবের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা উচিত তাহা করিও। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার বুদ্ধি এ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে না। দেখিও যেন নূতন বিপদ উপস্থিত না হয়। যে কার্য্য করিবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিবে। দুর্জ্জনকে পরীহার, বিজ্ঞের পরামর্শ। তুমি ও দিকে যথাবিহিত যত্ন ও চেষ্টা কর; আমিও একবার বরদাকান্তের নিকট যাইব। যদিও তিনি বিন্দুমাত্র সৎস্বভাবান্বিত নহেন, তথাপি তিনি প্রবীণ। আমি জানি, তিনি সমস্তই জানিয়াছেন এবং তিনিই পুত্রের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার উৎসাহদাতা—তথাপি একবার তাঁহার সহিত দেখা করা মন্দ পরামর্শ নয়।"

যোগেশ কহিলেন,—

"আপনার ইচ্ছা হয় দেখা করিবেন। কিন্তু তাহাতে কোন ইষ্ট সম্ভাবনা দেখিতেছি না। লোকটা কতদূর জঘন্য তাহা আপনার অগোচর নাই। যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় তাহা হইলে বিশেষ সতর্কভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন। তবে আমি এখনই প্রস্থান করি।"

গঙ্গাগোবিন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

বেলা ৩।০ বা ৪ টার সময় পাল্কী বাহকাদি সমস্ত প্রস্তুত হইল। যোগেশ রামনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পরে বাহকেরা উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এক

প্রান্তর-পর্শ্বিস্থ বৃক্ষমূলে পাল্কী নামাইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন, বারি-সেবন ও বিশ্রামার্থ অনতিদূরস্থ জলাশয় সমীপে গমন করিল। যোগেশ পাল্কী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মন নিতান্ত উদাস—অনন্ত চিন্তা সমাচ্ছন্ন। কি করিতে কোথা যাইতেছেন, বা কি করিলে কি হইবে, কিছুই যেন অবধারিত নাই। প্রান্তরের দিকে পশ্চাৎ করিয়া, পাল্কীর উপর ভর দিয়া যোগেশ অনন্ত শূন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন যেন, অনন্ত শূন্য সাগর মধ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছে। একাকী—সঙ্গে আর কেহ নাই। এক সঙ্গে, এককালে, বহুবিধ ঘটনা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিলে, মন বিচলিত, অস্থির ও ধারণাশূন্য হইয়া পড়ে। একটী ঘটনার চিন্তা হইলে, ন্যায়ের নিয়মানুসারে, ধারাবাহিকরূপে ঘটনার পরিণামে চিন্তা করা যায; কিন্তু বহু ঘটনা সম সময়ে চিত্তক্ষেত্রে সমাগত হইলে কদাচ তদ্রূপ হয় না। তখন চিত্তের উপর আর আধিপত্য থাকে না, ভাবনার ক্রম বা ধারা থাকে না, আবশ্যক অনাবশ্যক জ্ঞান থাকে না। তখন চিত্ত যেন উদাসীন ভাবে অনন্ত নীল নভস্তলে কপোতিনীবৎ উড্ডীন হইতে থাকে, অনন্ত সাগর-বক্ষে বায়ুবিতাড়িত তরণীর ন্যায় বিচলিত হইতে থাকে—উদ্দেশ্য শূন্য, লক্ষ শূন্য, বাসনা শূন্য, চেষ্টা শূন্য। যোগেশের চিত্তের অবস্থা অধুনা সেইরূপ। তিনি ঘোর চিন্তায় সমাচ্ছন্ন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এক্ষণে কোনই বিশেষ চিন্তা নাই। তাঁহার চিত্তের অবস্থা হৃদ্গত করিয়া দিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

সহসা পশ্চাতের দিক হইতে এক কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি সমাগত হইল। যোগেশ তাহার আগমন জানিতে পারিলেন না। আগন্তুক নিকটস্থ হইয়া যোগেশের মস্তক লক্ষ্য করিয়া, হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা এক বিষম আঘাত করিল। অব্যর্থ আঘাতে যোগেশ সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ তাঁহার শরীরে প্রকাশ পাইল। হত্যাকারী, যোগেশের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, দৌড়িয়া পলায়ন করিল। যোগেশের সংজ্ঞা শূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। তাঁহার আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, বাহক প্রভৃতি কেহই এ বিপদের সংবাদ পাইল না।

কালের কুটিল নিয়মের কে অন্যথা করিবে? মনুষ্য! তুমি কিসের গর্ব্ব কর? ভাবিয়া দেখ, তোমার যাবতীয় গর্ব্বের মূলস্থান দেহ ও

জীবন কি সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি! আশা-চক্রে নিবদ্ধ থাকিয়া মানব কি না করিতেছে? মানবের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন মানব স্থির করিয়াছে, তাহার জীবন অবিনশ্বর বা কল্লান্ত-স্থায়ী। কি ভ্রান্তি! প্রত্যেক কার্য্যে দেখিতেছি, জানিতেছি ও বুঝিতেছি যে, আমি যে কিছু লইয়া গর্ব্ব করি তাহার কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সকলই ক্ষণবিধ্বংসী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানব ক্ষণকালের নিমিত্তও এই সিদ্ধান্তকে হৃদয়ে স্থান দেয় না। এই আশ্চর্য্য, কৌশলময় মোহই মানবকুলের সাংসারিক কার্য্য সমস্তের নিয়ন্তা। এই মোহ না থাকিলে, মানব-জীবনের উৎসাহ, আনন্দ, আশা, সুখ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সমস্তই বিদূরিত ও তিরোহিত হইয়া যাইত—সংসার বিসদৃশ স্থান হইয়া উঠিত—মানব-জীবন নিরতিশয় ভারভূত হইয়া পড়িত। এই মোহ না থাকিলে, মানব! আজি কি তুমি সংসারে থাকিতে পারিতে? এই মোহ না থাকিলে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তুমি কি স্বীয় অদৃষ্টের উন্নতি করিতে? এই মোহ না থাকিলে, রোগ, শোক, দুঃখরাশি পরিবৃত বিশ্ব-ধামে তুমি কি ক্ষণকালের নিমিত্তেও তিষ্ঠিতে? এই মোহ না থাকিলে, মানব! তুমি কি অঙ্গুলি-পরিমিত ভূমির জন্য প্রাণাধিক সহোদরের সহিত কদাচ অবক্তব্য কলহানল প্রজ্বলিত করিতে? এই মোহ না থাকিলে, তুমি দরিদ্র! নিত্য শাকান্ন সেবন করিয়া কদাচ কি সন্তুষ্ট হইতে? এই মোহ না থাকিলে, সংসারের সকল বন্ধনই নির্ম্মূল হইয়া যাইত। ফলতঃ, সংসার যেরূপ প্রণালীক্রমে সংগ্রথিত, মোহ তাহার প্রধান সূত্র।

যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। কোথায় বিমলা? যে বিমলার জন্য যোগেশের এই বিপদ, সে বিমলা এক্ষণে কোথায়? কোথায় সংসার? কোথায় স্নেহময় পিতা? কোথায় পরম শত্রু রুদ্রকান্ত? মানবের এ বড় আশ্চর্য্য অবস্থা! এ অবস্থায় শত্রু মিত্র নাই, দ্বেষ হিংসা নাই, খলতা কপটতা নাই, প্রণয় অপ্রণয় নাই, মায়া মমতা নাই। সংসারের যাবতীয় স্পৃহা, আশা, ইচ্ছা এই অবস্থায় বিলীন হয়। যোগেশের মনে এখন আর কামিনী-কুল-কুসুম বিমলার প্রণয় নাই, মানব-কুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্তের শত্রুতা নাই, সংসারের কোন

প্রবৃত্তিই নাই!!! যোগেশের অচেতন দেহ ধরণীপৃষ্ঠে নিপতিত রহিল। তাঁহার বিপদের সময় কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, কেহ দেখিল না। তাঁহার বিপদে কেহ আহা বলিল না, কেহ হায় হায় করিল না। দেহ সমভাবে পড়িয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে তাঁহার বাহকেরা আসিয়া এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা ভয়ে নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের স্কন্ধেই যে এই ভয়ানক কাণ্ড আরোপিত হইবে ইহা তাহারা বিলক্ষণরূপ স্থির করিল। লাস কোন প্রচ্ছন্ন স্থানে ফেলিয়া দিয়া পলাতক হওয়াই তাহারা সৎপরামর্শ মনে করিল। তখন তাহারা পরামর্শানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিতা।

সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতে খাইতে স্বকীয় বারান্দায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। বরদাকান্তের বয়স পঞ্চাশের উপর। মাথার চুলের অর্দ্ধাধিক পাকা। তাঁহার গোঁপ বড় জাঁকাল। পাকা গোঁপ কলপ প্রয়োগে কাল মিচ্‌মিচে। দেহের বর্ণ শ্যাম। তনু লোমশ ও স্থূল। আকৃতি খর্ব্ব। বর্ণ ঘন-কৃষ্ণ।

বরদাকান্ত রায় তামাক খাইতেছেন। এমন সময় তথায় গঙ্গাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয়ের মুখে সভ্যতা ও সৌজন্যের ত্রুটি নাই। তিনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিবা মাত্র যথোচিত ভদ্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ের শিষ্টাচার প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইলে নিপতিত কাষ্ঠাসনে উভয়েই উপবেশন করিলেন। রায় মহাশয় কহিলেন,—

"মুখোপাধ্যায় মহাশয়! কি মনে করিয়া শুভাগমন?"

মুখোপাধ্যায় কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন,—

"বিশেষ মনে কিছুই নাই। আপনার সহিত সাক্ষাতাদি করাই উদ্দেশ্য। রুদ্রকান্ত বাবু আছেন ভাল ?"

বরদাকান্ত যেন কিছু বিষণ্ণ স্বরে কহিলেন,—

"কাল ইংরাজি পড়ার দোষ বিস্তর।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"কেন, বলুন দেখি ?"

বরদাকান্ত বলিলেন,—

"ও পাপ যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ। মস্তিষ্কের ও চক্ষুর পীড়া হবেই হবে। একটী ছেলে। আগে না জানিয়া ইংরাজি অভ্যাস করিতে দিয়া বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এখন আর হাত নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন, রুদ্রকান্ত বাবুরও মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিয়াছে নাকি ?"

বরদাকান্ত উত্তরিলেন,—

"সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন। বাবাজি মাথা ও চক্ষু লইয়া সমস্ত দিন কাতর।"

গঙ্গাগোবিন্দ সমস্তই বুঝিলেন; মস্তিষ্কের পীড়াটা কেবল নেশার ঘোর। চক্ষুর ব্যাধি কেবল চসমা ব্যবহারের সখ্। সে কথা গোপন করিয়া কহিলেন,—

"তবে তো বড় দুঃখের বিষয়! একটী সন্তান, অতুল বিষয়। অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিয়া জীবিকা যাপন করিবেন। এ দৈব বিড়ম্বনা বড় যাতনা। সকলই বিধাতার ইচ্ছা।"

বরদাকান্ত পরমভক্তের ন্যায় কহিলেন,—

"ভগবান্—তুমি সকলই করিতে পার।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"বিশেষ যত্ন রাখিবেন।"

বরদাকান্ত কহিলেন,—

"যত্নের কোনই ত্রুটি নাই।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—

"আপনার কুবেরের ভাণ্ডার। এক মাত্র সন্তানের ব্যাধি শান্তির নিমিত্ত আপনার যত্নের ত্রুটি হওয়া কদাচ সম্ভব নহে। তবে এরূপ পীড়ায় অর্থ ব্যয় ছাড়া আরও কিছু সাবধানতা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি রকম?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"যৌবনে মনুষ্যশরীরে কতকগুলি দোষ জন্মে। সেই দোষগুলি যাহাতে কম হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।"

বরদাকান্ত দন্তে রসনা কাটিয়া কহিলেন,—

"রাধামাধব। বাবাজিউর শরীরে কোনই দোষ নাই। তবে যদি কখন কিছু শুনিতে পান, সে অতি সামান্য। যৌবনে নিতান্ত সাধু ব্যক্তিরও তাহা থাকেই থাকে। সে জন্য পীড়ার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।"

গঙ্গাগোবিন্দ মনে মনে বলিলেন,—"তোমার সর্ব্বনাশ।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—

"এমন দোষও শুনা যায়, যাহা কোন ক্রমেই সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।"

বরদাকান্ত কুপিত স্বরে বলিলেন,—

"বলেন কি মুখোপাধ্যায় মহাশয়? রুদ্র আমার সচ্চরিত্রের একশেষ। আপনি যদি তার বিরোধে কখন কিছু শুনে থাকেন, নিশ্চয় জানবেন সেটা ভুল।"

গঙ্গাগোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"এই যে সম্প্রতি, বিমলার ব্যাপার শুনা যাইতেছে এটাও কি ভুল?"

বরদাকান্ত কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন,—

"সেটা জনরব মাত্র।"

গঙ্গাগোবিন্দ উচ্চ হাস্য সহকারে বলিলেন,—

"রায় মহাশয়। কি কথা বলেন? আপনি পুত্রের দোষ সংশোধন

করিতে আরম্ভ করুন। এ সকল বড় সর্ব্বনেশে কথা হইয়া উঠিতেছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—

"আপনি প্রবীণ হইয়া এ কথা বলেন এ বড় দুঃখের বিষয়। বালকের কথায় কি জনরবে বিশ্বাস করিবেন না। রুদ্র বড় সৎ। আমি বলিতেছি তাহার কোন দোষ নাই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন,—

"চখে দেখা বিষয় যেমন কদাচ অবিশ্বাস করা যায় না, তেমনি এ ব্যাপারের এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা কদাচ অবিশ্বাস করা যেতে পারে না। আপনি হাজার বলুন তথাপি এ আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, রামকৃষ্ণ ও রুদ্রকান্তই এই ভয়ানক কাণ্ডের মূল।"

বরদাকান্ত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"এ আপনার অন্যায় কথা। এমন বিশ্বাস হলে কি করা যেতে পারে।"

গঙ্গাগোবিন্দ কহিলেন,—

"করা সবই যেতে পারে। আপনি একটু মনোযোগী হলে সকলই হয়। আপনার উৎসাহ না পাইলে, রুদ্রকান্তের কি সাধ্য এমন করে।"

বরদাকান্ত চটিয়া বলিলেন,—

"আপনি আমায় কি করিতে বলেন ? বালক যদি একটা মন্দ কাজ করেই থাকে, তাই বলিয়া কি তাকে মেরে ফেলা বিধি ?"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"পিতা মাতার চক্ষে সন্তান চির দিন বালক। আপনার বালক সংসারে যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিবে, আপনি বালক বলিয়া সমস্তই উপেক্ষা করিবেন। কিন্তু লোকে তাহা সহ্য করিবে কেন ? অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। আপনাকে বলিয়া যদি তাহার উপায় না হয়, তাহা হইলে অগত্যা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।"

বরদাকান্ত যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

"আমার ছেলে যা খুসি করিয়াছে, তাহাতে লোকের যা সাধ্য থাকে করে যেন। কারো পাঁচীরে আমার একচালা নয়। আমিত কাকেও ভয় করি না।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"কারো পাঁচীরে আপনার একচালা নয় সত্য এবং কাকেও আপনি ভয় করেন না তাও যথার্থ। কিন্তু রায় মহাশয়! অধর্ম্ম কার্য্য কদিন চাপা রাখিবেন? পাপের ফল ভুগিতেই হইবে। আমি আপনাকে বলিতেছি আপনি সাবধান হউন, পুত্রকে সাবধান করুন্ এবং বিমলা কোথায় আছে, বলিয়া দিউন।"

বরদাকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—

"আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন নাকি? সাহস তো মন্দ নয়।"

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন,—

"সাহস অসাহসের কোন কথা নাই। আপনাকে ভয় দেখাতেও আমার আসা নয়। ভাল ভেবেই আপনাকে বলিতে এসেছি। আপনি প্রবীণ। ভাবিয়াছিলাম আপনি এ সকল শুনিলে অবশ্যই কোন সদ্যুক্তি হইবে। বুঝিলাম, তাহা হইবে না। আমার অপরাধ কি? প্রকৃত কথা বলিয়া যাই। রুদ্রকান্ত কৃত যাবতীয় দুষ্কৃতি লোকে এতদিন সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এবারকার এ কার্য্য কেহ সহ্য করিবে না। জানিবেন, এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইবে।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—

"আপনি যান তার তদ্বির করুন্‌গে। সাহসের কথাও মন্দ নয়।"

এই বলিয়া বরদাকান্ত রায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল। দেহ কাঁপিতে লাগিল। আবার বলিলেন,—

"আস্পর্দ্ধা কম নয়। লোক সব বড় বাড়িয়ে তুলেছে। এর প্রতিবিধান না কল্লে নয়।"

সম্পত্তিশালী, দুর্দ্দান্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গেলেও সে ভাবিয়া থাকে যে, তাহাকে গালি দেওয়া হইল। যাহার মত ও অভিপ্রায় নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন ও পরিচালিত হইয়া থাকে, সে কখন ঘটনাক্রমে তাঁহার অভিপ্রায়ের অন্যথা বা প্রতিবাদ হইতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হয় ও মর্ম্মান্তিক যাতনা পায়। অভ্যাসের দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই বরদাকান্ত মনে করিতে লাগিলেন যে, গঙ্গা-

গোবিন্দ প্রতি বাক্যে তাঁহাকে অযথা অপমানিত করিলেন। এ সিদ্ধান্ত মনে হইয়া তাঁহার আরও যাতনা হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হউক এ অপমানের প্রতিশোধ দিতে হইবে। দমন না করিলে স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া উঠিবে।

গঙ্গাগোবিন্দ দেখিলেন, বরদাকান্ত নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত আর কথাবার্ত্তা হওয়া অসম্ভব। বলিলেন,—

"মহাশয় আমি এক্ষণে চলিলাম।"

বরদাকান্ত সে কথার কোনও উত্তর দিলেন না। গঙ্গাগোবিন্দ বিরক্ত, দুঃখিত ও বিমর্ষ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন গঙ্গাগোবিন্দ বাটী ফিরিলেন তখন রাত্রি অনেক। তাঁহার মনের অবস্থা বড় ভয়ানক। কথঞ্চিৎরূপে আহারাদি শেষ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। কোথায় যোগেশ? কোথায় বিমলা? অত্যাচারী ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি নিয়ত অত্যাচার করিবে, তাহা অবাধে সহ্য করিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে বিষম হইয়া উঠিল। মনুষ্য-মন স্বভাবতঃ স্বাধীনতাপ্রিয়। স্ব স্ব স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে মানব নিতান্ত ব্যাকুল। গঙ্গাগোবিন্দ বরদাকান্তের এবম্বিধ ন্যায়বিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ প্রভুতায় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, আজি হউক বা কালি হউক, বরদাকান্তের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেই হইবে। যেরূপে হউক, তাঁহার এ অন্যায় দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে। গঙ্গাগোবিন্দের মন এবম্বিধ চিন্তা-পরম্পরায় অস্থির হইয়া উঠিল। নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি অনেক হইল। তিন প্রহর অতীত। পৃথিবী নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির। শন্ শন্ শব্দে নৈশ সমীর প্রধাবিত হইতেছে। চন্দ্রদেব মেঘ হইতে মেঘান্তরালে লুকাইতে লুকাইতে সত্বর স্বকার্য্য সাধন করিয়া পলায়ন করিতেছেন। আকাশ নির্ম্মল ও প্রশান্ত—যেন অনন্ত সমুদ্র। আকাশ হাসিতেছে, তাহার তারা হাসিতেছে, তাহার চন্দ্র হাসিতেছে। এত হাসি কেন হাসে? পৃথিবীর রঙ্গ দেখিয়াই তাহারা সকলে হাসিতেছে। ফলতঃ রাত্রিতে ধরণীর অনেক রঙ্গ। দিনে মানবগণ কার্য্য লইয়া ব্যস্ত হয়, সংসার মহা কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকে সত্য কিন্তু তখন এত রঙ্গ থাকে

না। আকাশ, চন্দ্র, তারা রজনীর রঙ্গের চিরন্তন সাক্ষী, সেই জন্য তাহাদের এত হাসি। হাসুক—হাসিতে, উপহাসে বা বিদ্রূপে এ রঙ্গ কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, শান্ত ও স্থির।

সহসা একি বিপদ? গঙ্গাগোবিন্দের গোশালা, রন্ধনশালা, নিবাসগৃহ সমস্ত এককালে ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। এ রাত্রে কে এ বিপদ ঘটাইল! রমণীগণের ভয় বিকম্পিত আর্ত্তনাদ ও কোলাহল উঠিল। গাভীগণ বিপদ ব্যঞ্জক স্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সন্নিহিত বৃক্ষসমূহস্থিত পাক্ষিগণ ঘোর চীৎকার করিয়া উঠিল। কুকুর সকল প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি গঙ্গাগোবিন্দ জল জল শব্দে চীৎকার ও পরকীয় সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিস্তৃত অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিতে লাগিল। এক এক জন করিয়া কয়েক জন প্রতিবেশী সমবেত হইল। কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে গঙ্গাগোবিন্দের ভবন বহ্নিচর্ব্বিত ভস্মাবশেষ হইয়া ভূমিতলে মিশাইয়া গেল! আলয়স্থিত জীববৃন্দের দশা কি হইল? যেরূপ ভাবে অগ্নি লাগিয়াছিল, তাহাতে মধ্যে হইতে কাহারও নিস্কৃতি লাভ করা অসম্ভব। ভবনস্থিত মানবগণকি ভস্মস্তূপে মিশাইয়া গেলেন?

বলা বাহুল্য এ বিষম অগ্নিকাণ্ড আপনি ঘটে নাই। সহজেই অনুমান করা যাইতেছে, ইহার মধ্যে অবশ্যই বরদাকান্ত রায়ের হস্ত আছে। অকারণ প্রতিহিংসার গতি এতদপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। প্রভুতা ও ক্ষমতা, বলে মানুষ এত অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। যে বিধাতা তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাদ্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সেই উপাদানে এই জঘন্য জীবগণের হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য! বরদাকান্ত ও তাঁহার পুত্রের অন্যায় অত্যাচারে একটী নিরীহ ভদ্র পরিবার এককালে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পাপের কি শাস্তি নাই? দৌরাত্মের কি প্রতিফল নাই?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী-তীরে।

ঘোর তিমিরা রজনী। জাহ্নবী কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিতা। প্রকৃতি শান্ত ও নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিক জনশূন্য। বহুদূরে বলরামপুরের জমিদারী কাছারির দ্বিতল গৃহে যে আলোক জ্বলিতেছে তাহারই ক্ষীণ ভাতি মাত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সুরধুনী তীরে এক খানি নৌকা সংলগ্ন। নৌকায় আরোহী নাই, তথাপি নাবিকগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, যেন এখনি নৌকা ছাড়িতে হইবে। নদীর পাহাড়ের উপরি কৃষকের ক্ষেত্র পরিরক্ষণার্থ এক খানি কুটীর রহিয়াছে। সেই কুটীর হইতে মনুষ্যের অপরিস্ফুট ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। এই ঘনান্ধকারময়ী রাত্রিকালে, পবিত্র সলিলা জাহ্নবী-তীরে, কুটীর মধ্যে বসিয়া যুবক যুবতী কাঁদিতেছেন।

আলোক নাই। যুবক যুবতীর আকৃতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। দেখিলে বুঝিতে, তাঁহাদের দেব-কান্তি। অন্ধকার—দেখা গেল না। অশ্রু-সংক্ষুদ্ধ স্বরে যুবক বলিতেছেন,—

"মনোরমে! কাঁদিয়া কি ফল, চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

মনোরমা আরও কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"নরেন্! গৃহে কাহার নিকট যাইব?"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"কেন মনোরমে! তোমার বৃদ্ধা জননীর নিকট যাইবে। তুমি ভিন্ন তাঁহার আর কে আছে?"

মনোরমা বলিলেন,—

"তোমারও তো বৃদ্ধা জননী ভিন্ন আর কেহ নাই।"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"সে কথা যথার্থ। কিন্তু উপার্জ্জন না করিলে আমার চলিবে না। আমাকে অগত্যা বিদেশে যাইতেই হইবে। আমার বৃদ্ধা জননীকে আমি যে ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইতেছি, সেও কেবল তোমারই ভরসায়।"

মনোরমা ক্ষণেক কি ভাবিলেন। সহসা নরেন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"নরেন্! আমাকে কাহার নিকটে রাখিয়া যাইতেছ? এ জগতে তুমি ভিন্ন আর সকলেই আমাকে ঘৃণা করে। জন সমাজে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হয়, লোকেও আমাব মুখ দেখিতে চাহে না। নরেন্! আমি কাহার নিকট থাকিব?"

নরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনোরমা পুনরপি কহিতে লাগিলেন,—

"আমার এ জীবনে কি সুখ হইবে নরেন্দ্র? যদি তুমি ভাবিয়া থাক যে, আমাকে সুখে রাখিবে, নরেন্দ্র, এখনও সে আশা ত্যাগ কর। এ জীবনে আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। কিছুতেই সুখ হইবে না। তুমি বৃথা চেষ্টা করিও না। আমি বালবিধবা, দরিদ্রতনয়া, শূন্য মনে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতাম, সেও আমার সুখ ছিল। সেও আমার আনন্দ ছিল! সকলে তখন আমাকে আদর করিত, আমাকে লইয়া সমবয়স্কেরা খেলা করিত, সকলে ডাকিয়া কথা কহিত। সে একদিন ছিল। সে দিন আর কিছুতেই আসিবে না। সে সুখের দিন গিয়াছে, সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, সে আশা মিটিয়াছে। নরেন্! এখন আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও ঘৃণ্য। আমার ছায়া স্পর্শ করিতেও লোকে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু আমার দোষ কি? আমি কি পাপ করিয়াছি? সংসারের অবিচার! পরের পাপে আমাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে! এই কি সমাজের নিয়ম? এই কি সংসারের ব্যবস্থা? পাপ, প্রেত, পিশাচ কুলকলঙ্কের জন্য আ—"

বলিতে বলিতে যুবতী মনোরমা উন্মাদিনীর ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার লোচন যুগল আকর্ণ বিশ্রান্ত

হইল। ললাটে কৃষ্ণ শিরা উদ্‌ভ্রান্ত হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্ন স্বরে যুবতী মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—

"পিশাচ রুদ্রকান্তের জঘন্য ব্যবহারের জন্য আমি নিরপরাধিনী আজীবন কাল যন্ত্রণানলে ভস্মীভূত হইব! আমার অপরাধ কি? পাপীর শাস্তি হইল না। সে নারকী ঘোর দুষ্কার্য্য করিয়া পুণ্যাত্মারূপে সংসারে সমাদৃত হইতে লাগিল। আর আমি নিরপরাধিনী পরকৃত পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। হায়! ইহারই নাম শাসন। ইহাকেই সমাজ বলিয়া লোকে সম্মান করে! এই পাপ রাজ্যের নাম পুণ্যময় সংসার। নরেন্দ্র! প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম! কিসে আমার এ যন্ত্রণা অপগত হইবে? কি করিলে আমার এ বিষম শাস্তির অন্যথা হইবে? কি উপায়ে জগৎ সংসার আবার আমাকে নিষ্পাপ বলিবে? ওঃ! আমি পাপী নই, অথচ লোকে আমাকে পাপী বলিবে? এ কষ্ট সহে না নরেন্দ্র! এ কষ্ট অসহ্য! ইহার উপায় কর।"

মনোরমার ক্লেশের সীমা নাই। নির্দ্দোষীকে দোষী বিবেচনায় যদি সমাজ চিরদিনের মত অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তদপেক্ষা ক্লেশের কারণ আর কি হইতে পারে? মনোরমার হৃদয়ে এককালে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সুন্দরী মনোরমা হৃদয়ের ক্লেশ শান্তির উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সুশীলার কষ্ট দেখিয়া নরেন্দ্র যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার লোচন দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু নিঃসৃত হইতে লাগিল। রোদনপরায়ণ নরেন্দ্র মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। নরেন্দ্রের নেত্রনিঃসৃত বারি মনোরমার পবিত্র ললাটে নিপতিত হইল। মনোরমা আবার বলিলেন,—

"উপায় নাই। আমার যন্ত্রণা নিবারণের উপায় নাই। বৃথা চেষ্টা! নরেন্! আমার জন্য তুমি কাঁদিতেছ? কেন নরেন্দ্র! তুমি সে দিন আমায় বাঁচাইলে? যদি না বাঁচাইতে—নরেন্দ্র! যদি তুমি আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে না বাঁচাইতে, তাহা হইলে অদ্য আর আমায় কাঁদিতে হইত না, তোমাকেও কাঁদাইতে হইত না।

তাহা হইলে আমি কি সুখী হইতাম? তোমারও কি সুখ হইত না নরেন্! তোমারও ভাল হইত। আমি তোমার গলগ্রহ হইতাম না। আমার জন্য তোমায় আর চিন্তা করিতে হইত না। তোমার অসংখ্য চিন্তার মধ্যে এ চিন্তা থাকিত না। নরেন্দ্র! কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"তোমায় কেন বাঁচাইলাম, মনোরমে! তোমায় কেন বাঁচাইলাম জিজ্ঞাসিতেছ? কি বলিব? প্রাণাধিকে! কি বলিয়া তোমার কথার উত্তর দিব? আমি জানি না, কেন বাঁচাইলাম। মনোরমা! তুমি যদি আমার হৃদয়ের ধন হও, তবে তুমিই জান আমি তোমায় কেন বাঁচাইলাম। মনোরমে! প্রিয়তমে! জীবিতাধিকে—কি হইল! এত করিয়াও আমি তোমাকে শান্তি দিতে পারিলাম না।"

নরেন্দ্র বস্ত্রে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনোরমা কহিলেন,—

"বিধাতার কি বিড়ম্বনা? তোমার সহিত এত আত্মীয়তা কেন হইল? এ অপাত্রে তুমি কেন প্রণয় স্থাপন করিলে? আমার জন্য তোমার এত কষ্ট কেন নরেন্দ্র? হতভাগিনী নিজে পুড়িল। আবার তোমাকেও পোড়াইল। নরেন্দ্র তুমি কেন এ পাপে ডুবিলে? যে কথা সংসারকে বলিবার উপায় নাই, যে কথা শুনিলে জগৎ মুখ বিকৃত করিবে, লোকে নিন্দা করিবে, সমাজ দোষ দিবে, তাহা তো সুখের নহে। নরেন্! তুমি দেবতা। তোমাকে আমার নিমিত্ত এই কলঙ্করাশি বহন করিতে হইল।"

নরেন্দ্র মুগ্ধের ন্যায় মনোরমার কথা শুনিতেছিলেন। কথা থামিল। তাঁহার চৈতন্য হইল, কহিলেন,—

"মনোরমা! আজি এই নির্জ্জন প্রান্তরে, গভীর রজনীতে, তরঙ্গাভিঘাতিনী জাহ্নবী তীরে, কুটীর মধ্যে তোমাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিতেছি সংসার, জগৎ, সমাজ, সমস্ত একদিকে হইলেও তোমা হইতে আমার মর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। কিসের ভয় মনোরমে? সমাজের ভয়? আমি সমাজের ভয় করিতাম, সমাজের শাসন শুনিতাম,

সমাজের অনুগামী হইতাম, যদি সমাজের নিয়ম, ব্যবস্থা ও সততা থাকিত। এ সমাজের নিয়ম নাই, সততা নাই। যে সমাজে দুষ্টের জয় ও শিষ্টের পরাজয় ঘোষণা করে, আমি সে সমাজের ভয়ে মনের ইচ্ছা ভাসাইতে পারি না। মনোরমা যাহার যত ক্ষমতা সে আমার নিন্দা করুক, আমার কুৎসা সংসারময় প্রচারিত হউক, আমি তথাপি এ বিচারবিহীন, পক্ষপাতী সমাজের কথায় কর্ণ দিব না। মনোরমা! তুমি বালিকা। অত্যল্পে তোমার হৃদয়কে আঘাত করে। আমরা অনেক দেখিয়াছি। দুর্ব্বলকে উৎপীড়িত করা আমাদের জাতীয় স্বভাব। তুমি যদি আমার মত সমাজকে অবহেলা করিতে শিখিতে, তুমি যদি আমার মত জাতীয় চরিত্র সম্যক বিদিত থাকিতে, তাহা হইলে তুমিও লোকের কথায় কাতর হইতে না। মনোরমা, তুমি কাতর হইও না।"

মনোরমা নরেন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"প্রিয়তম! আমি তোমার জন্য বড় কাতর। তোমার কি হইবে? আমি তোমার কোন্ কাজে লাগিব? এ রহস্য কতদিন থাকিবে? সংগোপনে আর কত দিন চলিবে? আর নরেন্! আমরা কি পাপ করিতেছি? আমাদের প্রণয় কি ধর্ম্ম বিগর্হিত? নরেন্! সত্য করিয়া বল, আমরা কি অসাধু কার্য্যে রত? যদি তাহা হয়, যদি আমাদের এ প্রণয় নীতি বিগর্হিত হয়, তবে আমার অনুরোধ—অদ্য আমাদের প্রণয়ের শেষ সাক্ষাৎ হউক। আমি আমার জন্য বলিতেছি না। আমি যে ভাবে এ ভয়ানক কথা বলিলাম তাহা আমিই বুঝিতেছি। আমি তোমার জন্য ভাবিতেছি। যদি আমরা পাপে রত হইয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি পাপীয়সী, আমার অধিক ক্ষতি হইবে না। আমার সমুদ্রে শয্যা, শিশিরের ভয় কি নরেন্? আমি যদি আজ হইতে পরম সাধুতায় জীবন পর্য্যবসিত করি, তাহা হইলেও জন সমাজ আমাকে আর পূর্ব্ববৎ সমাদর করিবে না। আমার এ কলঙ্ক আর কিছুতেই ঢাকিবে না। কিন্তু নরেন্! তুমি সাধু, পুণ্যাত্মা—তোমার নাম নিষ্কলঙ্ক। তুমি যে এই হতভাগিনীর সংসর্গে কলঙ্কিত হইবে, ইহা তো আমার প্রাণ থাকিতে সহিবে না। আমি সমস্ত ক্লেশ অবাধে সহ্য করিব, কিন্তু তোমাকে কেহ যদি

নিন্দা করে, কি তোমার নামে কলঙ্ক ঘোষণা করে, তাহা আমার প্রাণ থাকিতে সহিবে না। নরেন্! আজি তুমি আমায় সত্য করিয়া বল, আমাদের প্রণয়ে দোষ আছে কি না।"

মনোরমার প্রত্যেক কথা যেন নরেন্দ্রের হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এমন কথা আর কখন শুনি নাই। সস্নেহে মনোরমার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"মনোরমে! তুমি পাগলিনী। আজি অসময়ে তোমার হৃদয়ে এ নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল কেন? এ কি কথা মনোরমে?"

মনোরমা কহিলেন,—

"নরেন্! আজি তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইতেছ। কবে আসিবে স্থির নাই। আসিয়াই আমার দেখা পাইবে কি না সন্দেহ। কি জানি এ পাপজীবন যদি নাই থাকে। সেই জন্য নরেন্! আজি সমস্ত মনের কথা বলিতেছি। আমি তোমারই ভরসায় সকল সহি। তোমাকে দেখিতে পাইব, এই আশায় সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করি। কিন্তু প্রিয়তম! তুমি যখন এখানে না থাকিবে, তখন আমি কি সাহসে, কোন্ ভরসায় লোকের গঞ্জনা সহ্য করিব? নরেন্! তুমি কতদিন পরেই হয়ত আসিবে? আসিয়া হয়ত আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—

"তবে মনোরমে! তবে আমি যাইব না।"

মনোরমা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—

"না না নরেন্দ্র, তাহা হইবে না। তোমাকে যাইতে হইবে। ভালবাসার কি এই রীতি? তোমার যাহাতে ভাল হয়, তোমার যাহাতে ইষ্ট আছে, তাহাতে বাধা দিব? ছি ছি! নরেন্দ্র ও কথা বলিও না। তোমাকে যাইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। তুমি আমার জন্য ভাবিও না।"

নরেন্দ্র বলিলেন—

"কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া একপদ অন্তরে যাওয়াও আমার অসাধ্য।"

মনোরমা হাসিয়া বলিলেন,—

"আমার মিছে কথা।"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"শুন মনোরমে! তোমায় মনের কথা বলি শুন। এ জগতে আমার এক বৃদ্ধা জননী ভিন্ন আর কেহ নাই। তাঁহারও যে দশা, তাহাতে তাঁহার দীর্ঘ জীবনের আশা নাই। বল মনোরমে, আমাকে সংসারে বদ্ধ করিবার আর কি বন্ধন আছে? আজিও আমি সংসারে স্বাধীন হই নাই। জননীর ক্লেশাশঙ্কায় আমাকে অনভিমত কার্য্যও করিতে হইতেছে। আজ যদি আমি স্বাধীন হই—তুমি দেখিবে মনোরমা! কালি এ জগতে আর কাহার ভয়ে আমি ভীত হইব না। যদি এ স্থান আমাদের না চাহে, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, মনোরমে! এমন স্থান এ জগতে যথেষ্ট আছে, যথায় আমাদের এ প্রণয়ের বিরোধী নাই। মনোরমা! আমি তোমার জন্য জগৎ ত্যাগ করিব, সংসার ত্যাগ করিব, কলঙ্ক বহন করিব, সকলই উপেক্ষা করিব। আর মনোরমা! আজ যদি তুমি বল, নরেন্দ্র তোমার কেহ নহে, কালি হইতে, তাহা হইলে, আর তুমি নরেন্দ্রের নামও শুনিতে পাইবে না। নরেন্দ্র জন সমাজ ত্যাগ করিয়া কল্য হইতে অরণ্যচারী হইবে। সেই নির্জ্জন অরণ্যে বসিয়া গিরিনিঃসৃত নির্ঝরিণী সহ স্বীয় অশ্রুবারি মিশাইবে, বন বিহঙ্গিনীর সহিত স্বীয় স্বর মিশাইয়া প্রেমের গীতি গাইবে, বন কপোতকে নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কপোতিনীর প্রেমে ভাসিতে নিষেধ করিবে, সহকারকে সোহাগে মাধবীলতা বক্ষে জড়াইতে বারণ করিবে, আর তপস্বি-বেশ ধরিয়া ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় আজীবন তোমার নাম জপিবে। মনোরমা! আমি তোমাতেই জীবন সমর্পণ করিয়াছি। সুখ, দুঃখ তোমারই উপর ঢালিয়া রাখিয়াছি। তুমি দুঃখিত হইও না, মনোরমা। তোমার দুঃখ দেখিলে আমার বড় দুঃখ হয়। মনোরমা! আমি পাষাণ নহি।"

মনোরমা নরেন্দ্রের বক্ষ মধ্যে বদন রাখিয়া কহিলেন,—

"এ দুঃখিনীর অদৃষ্টে এ কি সুখ নরেন্দ্র? এত সুখ আমার কপালে! আমার এত সুখ সহে না। সত্য বলিতেছি নরেন্দ্র! আমি যখন তোমার নিকট থাকি, তখন কেন বোধ হয় যে আমি সুখ-

সাগরে ভাসিতেছি। তুমি চলিয়া গেলে এ অপার্থিব সুখ ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব? তুমি বিদেশে গেলে আমার কি হইবে নরেন্দ্র? আমি তোমার সঙ্গে গেলে ভাল হয় না?"

"সে কি সম্ভব?"

মনোরমা এ কথায় কোন উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলেন না। উভয়ে অনেক ক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর যোগেন্দ্র কহিলেন,—

"রাত্রি অনেক হইয়া গেল। প্রাতঃকালের আর বিলম্ব নাই বোধ হয়।"

মনোরমা যেন চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া কহিলেন,—

"তুমি যাইবে বলিতেছ? তোমার যাইবার সময় হইয়াছে। নরেন্! তুমি এখনি যাইবে? আ—"

মনোরমা আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন্দ্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, আমি যদি দরিদ্র না হইতাম! বলিলেন,—

"তবে আমি যাইব না।"

মনোরমা ব্যগ্র ভাবে কহিলেন,—

"না নরেন্দ্র তুমি যাও। আমি অসাবধানতায় কি বলিয়াছি? সে কথা মনে করিও না।"

এই সময় নৌকা হইতে মাঝি উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—

"বাবু! সময় বয়ে যায়।"

এই কথা শ্রবন মাত্র মনোরমা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন,—

"মনোরমে! অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, আমি আজি যাইব না।"

মনোরমা অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। পরে বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"নরেন্! তুমি যাও। বিলম্ব করিও না। সময় বহিয়া গেলে পথে কষ্ট পাইবে।"

নরেন্দ্র কহিলেন,—

"মনোরমে! তোমাকে কাঁদাইয়া আমি স্বর্গে যাইতেও প্রস্তুত নহি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"আমার জন্য সতত কাঁদিবে না ?"

"না—তুমি আমাকে প্রত্যহ পত্র লিখিবে ?"

"লিখিব—তুমিও লিখিও।"

"লিখিব।"

মাঝি আবার ডাকিল। নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"বল মনোরমে! যা মনে থাকে বল।"

মনোরমা বলিলেন,—

"যাও।"

নরেন্দ্র পুনরায় মনোরমাকে প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মনোরমে! তবে যাই।"

নরেন্দ্রের লোচন প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু। মনোরমা ঘাড় নাড়িলেন। আলিঙ্গন ছিন্ন হইল। একপদ, দুইপদ, তিনপদ। নরেন্দ্র ক্রমে পাহাড়ের নীচে গেলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন না। পাষাণে বুক বাঁধিয়া নৌকায় উঠিলেন। শুকতারা সমুদিত হইয়াছে। উষা সমাগতা প্রায়। রজনী এখন শুভ্র বর্ণ। নরেন্দ্র নৌকায় উঠিলেন, মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা অনেক জলে গেল। নরেন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন—দেখিলেন, মনোরমা গঙ্গানীরে আবক্ষ নিমগ্না। মাঝিকে কহিলেন,—

"মাঝি! শীঘ্র নৌকা ফিরাও।"

মাঝি বিরক্ত হইয়া নৌকা ফিরাইল। নিকটস্থ হইলে নরেন্দ্র নৌকার উপর হইতে ঝম্প দিয়া মনোরমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন।

মাঝিকে বলিলেন,—

"মাঝি! আমার যাওয়া হইল না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জাহ্নবী-বক্ষে।

কাহার জন্য কে কাঁদে? তুমি অনাথা! পতিবিয়োগ-বিধুরা, অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে রোরুদ্যমানা কিন্তু বল দেখি, তোমার দুঃখে পৃথিবীর কটা লোক কাঁদে? যে তোমায় দেখিল, হয়ত সে একবার আহা বলিল, এক মুষ্টি তণ্ডুল দিল, বা যৎসামান্য সাহায্য করিল। জগতে সহানুভূতি-স্রোত ঐই পর্য্যন্ত প্রধাবিত। কিন্তু বল দেখি কে তোমার হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশাইয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিল? বল দেখি কে তোমার দুঃখ নিজদুঃখ বিবেচনায় তাহা বিদূরিত করিতে বিচেষ্টিত হইল? তোমার ক্লেশরাশিতে কাহার হৃদয়-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইল? এরূপ কাঁদিবার লোক এ জগতে বড় কম। যদি এই পাপ, স্বার্থ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষাময় পৃথ্বীরাজ্যে তদ্বিধ লোক দেখিয়া থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি দেবতা, তিনি এ জগতের লোক নহেন। সাধারণ উপাদানে তাঁহার হৃদয় বিনির্ম্মিত নহে। তিনিই সাধু, উদার, মহৎ ও উপাস্য।

কাহার জন্য কে কাঁদে? আজি আমি প্রাণাধিক প্রিয়তম আত্মীয়-বিয়োগে উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে ধূলি ধূসরিত কায়ে চীৎকার করিয়া মেদিনী বিদীর্ণ করিতেছি, সংসার যন্ত্রণার আলয় বলিয়া বোধ করিতেছি, চতুর্দ্দিক শূন্য ও নিরানন্দময় দেখিতেছি, কিন্তু ঐ দেখ আমার পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর নবকুমার হইয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি বাটীতে নহবৎ উঠাইয়াছেন, আনন্দ ধ্বনিতে তাঁহার বাটী তোলপাড় হইতেছে। কাহার জন্য কে কাঁদে? আবার ঐ দেখ, আমার শোক-বিকলিত চীৎকারে তাঁহার আনন্দের বিঘ্ন জন্মিতেছে বলিয়া তাঁহার লোক আসিয়া আমাকে কাঁদিতে বারণ করিতেছে। হায়! এ সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

কাঁদিলে কি কাঁদার সীমা হইবে? মানুষ কত কাঁদিবে? প্রত্যেকের জন্য যদি প্রত্যেককে কাঁদিতে হয়, তবে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সংসার

ক্রন্দনের বিরাম পাইবে না। মানুষকে অহর্নিশ কাঁদিতে হইবে। সংসার ক্রন্দন রোলে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। কাঁদিয়া পার পায় না, এজন্যই কাহার জন্য কেহ কাঁদে না।

বিমলার বিপদের সীমা নাই, যোগেশের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয়, গঙ্গাগোবিন্দ বিপদ বিদলিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যৎপরোনাস্তি বিপদ। কিন্তু তুমি কি বল, যতদিন তাঁহাদের বিপদ বিদূরিত না হয়, যতদিন তাঁহারা পূর্ব্ববৎ আনন্দসাগরে ভাসিয়া না বেড়ান, ততদিন সংসারের সমস্ত লোক অনন্যকর্ম্ম হইয়া তাঁহাদের দুঃখে যোগ দিউক, তাঁহাদের সহিত কাঁদুক, আপনাদিগকেও তাঁহাদের ন্যায় বিপদাপন্ন মনে করুক। সাম্যবাদি, যদি তোমার যুক্তিতে এরূপ উপদেশ দেয়, তবে নিশ্চয় জানিও তোমার উপদেশ কখন কার্য্যে পরিণত হইবে না। বিমলা প্রভৃতির বিপদ যথেষ্ট হইলেও, সংসার তজ্জন্য আত্মামোদ ত্যাগ করিল না। সংসারে কাহার জন্য কে কাঁদে?

ঐ যে জাহ্নবী-বক্ষ বিদারণ করিয়া অতি প্রত্যূষে ক্ষুদ্র তরণী খানি ভাসিয়া যাইতেছে, উহার আরোহী কাহার জন্য কাঁদিতেছে? আত্মকার্য্যে সংসারের সকলেই ব্যাপৃত। কাহার জন্য কে কাঁদে?

পবিত্র সলিলা ভাগীরথী হৃদয়ে প্রত্যূষ। কি মনোহর দৃশ্য! গ্রীষ্মকালের প্রাতঃসমীরণ সলিল সম্বলিত হওয়ায় নিরতিশয় শীতল। নৌকা-আরোহিগণ শীতানুভব করিতেছে। নদী-বক্ষে কুজ্ঝটিকা। তরণী সেই ঘোর কুজ্ঝটিকা রাশি ভেদ করিয়া মেঘ মধ্যস্থ কপোতিনীর ন্যায় ভাটার স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে।

তরণী তীরবেগে চলিতেছে। তন্মধ্যে দুই জন আরোহী। সেই দুই জন নরেন্দ্র ও মনোরমা। সেই স্রোত প্রবাহী তরণী মধ্য হইতে কোকিল-বিনিন্দিত মধুময় কণ্ঠে অমৃত নিঃসারী সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল। মনোরমা গাইতেছেন। সেই মনোহর সময়ে, হৃদয়ের অতি গূঢ়তম প্রদেশের অতি গূঢ়তম ভাব, বীণা বিনিন্দিত স্বরে মনোরমার বদন বিনির্গত হইতে লাগিল। সঙ্গীত যেন জাহ্নবী দেহাবরণকারী কুজ্ঝটিকা রাশির সহিত মিশিয়া গেল, যেন ভাগীরথীর কুল কুল শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া গেল, যেন সেই শীতল সমীরণ সেই সম্মো-

হর সঙ্গীত শব্দ সঙ্গে করিয়া কোথায় লইয়া গেল, যেন সেই সঙ্গীত ধ্বনি হৃদয়, মন, প্রাণ উদাস করিয়া আত্মাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। যে শুনিল সে ভাবিল,, হায় কি শুনিলাম। মনোরমা গাইতে লাগিলেন,—

"জীবন মরণ মম, তোমারি অধীন কান্ত।
তোমারি কারণে নাথ, তুচ্ছ এ বিশ্ব নিতান্ত।
মানবের বাক্যবাণ, বিঁধে বিহঙ্গিনী প্রাণ,
গঞ্জনার অপমান, সরলা অবলার
সদা করে, হে! প্রাণান্ত।
সহেছি সব সহিব, ভুগেছি আর ভুগিব,
মরিয়াও না মরিব, তোমারি করুণা লোভে
রয়েছি, প্রিয়! প্রশান্ত।
মিটে না মনের আশা, তব দর্শন পিপাসা,
মনোবাসে বাঁধি বাসা, আশা রাশি মিলি রহে
সদা হে কান্ত! অশান্ত।
যদি নাথ কর ঘৃণা, সব সহে তা সবে না,
জীবন যাবে রবে না, তখনি অবনী হতে
যাবে এ নাম একান্ত।"

নরেন্দ্র তন্মন হইয়া সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। সঙ্গীত থামিল। তাঁহার চেতনা হইল। মনোরমার নিরুপম বদন মাধুরীর প্রতি সস্নেহে দৃষ্টি দিয়া কহিলেন,—

"মনোরমে! তোমার কি বিশ্বাস হয়, কখন তোমার ভয় ফলিবে?"

মনোরমা কেবল একটু হাস্য করিয়া নরেন্দ্র কৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। সে হাস্যের কত অর্থ তাহা যিনি বুঝিবার তিনিই বুঝিলেন।

তাহার পর নরেন্দ্র বিষাদ ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—

"মনোরমে! তুমি আপনি যে আপনাকে ঘৃণা কর সে জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। বল কি করিলে তোমার মন সুস্থ হয়। মনোরমা! কেন তুমি এমন করিয়া কষ্টভোগ কর।"

মনোরমা কহিলেন,—

"নরেন্! আমি রমণী। আমার হৃদয় দুর্ব্বল। আমার যখন মনে হয় যে, এ জীবনের মত সততা আমাকে এককালে ত্যাগ করিয়াছে, যখন মনে হয় যে, সংসারের লোক আমাকে অসতী, কুলটা, বার-বণিতাগণের সহিত সমান বলিয়া মনে করে, যখনি মনে হয়, এ জীবন আমাকে ঘৃণার্হ হইয়া পাত করিতে হইবে, নরেন্! তখন আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। তখন আমার মনে হয় যে, আমি কেন এতদিন মরিলাম না। তখন ভাবি আমি বুঝি তোমাকেও কলুষিত করিতেছি। নরেন! আমি তো কোন্ কালে মরিতাম। মরি নাই এক কারণে। এক বন্ধন আমি ছিন্ন করিতে পারিলাম না। সে কারণ, সে বন্ধন তুমি। নরেন্! আজি যদি আমি মরিয়া যাই, কালি হইতে আর তোমাকে দেখিতে পাইব না, তোমার সহিত আত্মীয়তা ঘুচিয়া যাইবে। তবে মরিয়া সুখ কি নরেন্? তোমাকে ছাড়িয়া মরিলেও সুখ হইবে না। এ জীবনের যত গঞ্জনা তাহাও ভাল, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া মরা ভাল নয়। নরেন্! আমি তোমাকে ছাড়িয়া মরিতে পারিলাম না, পারিবও না। স্বর্গের দ্বার যদি এখনি আমার নিমিত্ত নির্ম্মুক্ত হয়, আর যদি এখনি না যাইলে আমার জন্য সে দ্বার চিররুদ্ধ হয়, তথাপি নরেন্দ্র, আমি তোমাকে ফেলিয়া স্বর্গে যাইতে পারিব না। নরেন্! আমার মরা হইবে না।"

মনোরমা কথার উপসংহারকালে স্বীয় মনোহর মৃণালবৎ ভুজলতা দ্বারা নরেন্দ্রনাথকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। নরেন্দ্র মনোরমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

"মনোরমে তুমি কি ভাবিয়াছ আমায় ছাড়িয়া মরিতে পাইবে?"

মনোরমা ব্যস্ততা সহকারে আলিঙ্গন ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—

"ছি ছি ছি! নরেন। ও কথা মুখেও আনিও না।"

"কেন?"

"শুনিলে আমার গা শিহরিয়া উঠে, হৃদয় অস্থির হয়।

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—

"জানিও সকলেরই হৃদয় সমান।"

দেখিতে দেখিতে নৌকা আসিয়া হরিপাড়া নামক গ্রামের তীরে

লাগিল। তখন প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব তখন পূর্ব্বাকাশে সমুদিত।

বলরামপুর হইতে হরিপাড়া জলপথে প্রায় এক ক্রোশ হইবে, স্থলপথে তদপেক্ষা কম। হরিপাড়া হইতে রায়নগর ৫ পাঁচ ক্রোশ দূরে স্থিত। অবন্তীপুর এখান হইতে দশক্রোশ পশ্চিম দক্ষিণ।

নরেন্দ্রনাথ ও মনোরমাকে বহন করিয়া নৌকা প্রাতঃকালে আসিয়া হরিপাড়ার ঘাটে লাগিল। প্রণয়িযুগল নৌকা হইতে নামিলেন। সহসা দক্ষিণপার্শ্বে অঙ্গুলি ভঙ্গ করিয়া মনোরমা কহিলেন,—

"দেখ দেখ ঐ বালির উপর একটী ভদ্র লোকের মৃতদেহ যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে!"

নরেন্দ্র কিয়ৎকাল দেখিয়া বলিলেন,—

"মৃতদেহ বটে, ভদ্রলোকও বটে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মৃত নয়। বস্ত্রাদিতে রক্ত দেখিতেছি। অবশ্য ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে। দাঁড়াও নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখি।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ দেহ সন্নিধানে গমন করিলেন। মনোরমাও সঙ্গে গেলেন। নিপতিত নরদেহের বদন বস্ত্র সমাচ্ছন্ন। নরেন্দ্র তাহা নির্ম্মুক্ত করিলেন না; অন্য প্রকারে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,—

"দেহ মৃত নয়, কিন্তু মৃতপ্রায়।"

মনোরমা সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"বল কি?"

"দেখিলাম দেহে জীবন আছে। অযত্নে থাকিলে মরিয়া যাইবে। যত্ন করিলে বাঁচিবার আশা আছে।"

মনোরমা সোদ্বেগে কহিলেন,—

"নরেন! উপায়?"

"দেখা যাউক!"

তাঁহারা অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বালিকা।

রামনগরের প্রান্তভাগে এক প্রশস্ত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে সরমা ও আর একটী বালিকা বসিয়া রহিয়াছেন। সরমা অধ্যয়নে নিযুক্তা। তাঁহার হস্তে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। সরমা পড়িতেছেন, সময়ে সময়ে উদ্বিগ্নের ন্যায়, যেন কি কোথায় হারাইয়াছেন ভাবিয়া, চারিদিকে চাহিতেছেন, আবার পড়িতেছেন।

সরমা সুন্দরী। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ। দেহের গঠন অতি-পরিপাটী। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অতি স্নিগ্ধ ও মনোরম। লোচন যুগল নিবিড় কৃষ্ণ ও আয়ত। সরমা নিতান্ত কৃশাঙ্গী নহেন বা নিতান্ত স্থূলাও নহেন। তাঁহার দেহ হাড়ে মাসে জড়িত।

সরমার নিকটে যে বালিকা বসিয়া আছে, সে তাঁহার স্বামী কেশবের সোদরা। তাহার বয়স অনুমান সাত বর্ষ। বালিকা একটী বাক্স লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বাক্স মধ্যে নানাবিধ পুত্তলী। বালিকা কাহাকে পুত্র, কাহাকে কন্যা, কাহাকে পৌত্র, কাহাকে দৌহিত্র রূপে সাজাইয়া সংসারের সমস্ত সাধ মিটাইতেছে। কখন বা কন্যা, বিবাহ যোগ্যা হইল দেখিয়া, তাহার বিবাহের নিমিত্ত ঘোর চিন্তা করিতেছে, কখন বা পুত্রবধূ সুন্দরী হয় নাই বলিয়া দুঃখিতা হইতেছে। বালিকার বাক্স মধ্যে প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা, বা তদপেক্ষা অল্প, সময়ে সূর্য্যোদয় হইতে পুনরুদয় পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হইতেছে ও তদনুযায়ী সাময়িক কার্য্য সমস্তও সম্পন্ন হইতেছে।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া সরমা পুস্তক রাখিলেন। বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—

"হিমু! কি হচ্চে?"

হেমাঙ্গিনী তখন নাতিনীর বিবাহে লোকজন খাওয়াইতে বড় ব্যস্ত। সরমার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সরমা আবার কহিলেন,—

"হিমু! হাস্‌ছিস, বক্‌ছিস, হাত নাড়্‌ছিস, তুই পাগল হলি নাকি ?"

হিমু এবারেও সরমার কথা শুনিল না। সরমা ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া হেমাঙ্গিনীর একটী পুত্তলী অপহরণ করিলেন। যেটী চুরি করিলেন সেটী হেমাঙ্গিনীর ছেলে। হেমাঙ্গিনী তখন তাহা জানিতে পারিলেন না। ক্ষণপরে হেমাঙ্গিনীর অপহৃত পুত্রের প্রয়োজন হইল। চারিদিকে সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। তখন দুঃখিত স্বরে সরমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"বৌ! আমার ছেলে কি হলো ?"

বধূ সরমা হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—

"হিমু! তোমার কি লুকিয়ে বিয়ে হয়েছিল ?"

বালিকা এ পরিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। বলিল,—

"বল, আমার ছেলে কোথায় ?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"আগে তোমার বিয় হউক, তার পর তবে ছেলে।"

হেমাঙ্গিনী কুপিত ভাবে বলিল,—

"যাও।"

সরমা বলিলেন,—

"কেন, বর কি চাও না।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—

"যাও, য়্যাঁ, আমার ছেলে কোথায় বল।"

পরিহাস প্রিয়া সরমা হেমাঙ্গিনীর পুত্তলী দিলেন। বলিলেন,—

"বিয়ে হলে আর তো খেলা হবে না।"

হেমাঙ্গিনী বলিলেন,—

"তবে বিয়ে হবে না।"

"বিয়ে হবে না, তবে কি আইবুড় থাক্‌বি ?"

হেমাঙ্গিনী ঈষৎ হাস্য করিলেন।

সরমা আবার বলিলেন,—

"তবে সেই কথাই ভাল। আজ সকলকে বলিব এখনি যে, হিমুর বিবাহের দরকার নাই।"

সরমার এ কি প্রকৃতি! তাঁহার চিরপরিচিত ... ত্মীয়া বিমলার বিপদ সংবাদ তাঁহার অগোচর নাই। অন্য বিপদ সমন্বে ... অদ্যাপি নানাবিঘ্ন কারণে তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। না হউক—তথাপি এক বিমলার বিপদই কি তাঁহার পক্ষে কম? তবে সরমার এ ভাব কেন? এ হাস্য মুখ কেন? সরমা নবনীত পুত্তলী। সরমা তো পাষাণী নহেন! এ সুকুমার দেহ মধ্যে কি আয়স হৃদয় প্রতিষ্ঠিত আছে? সরমা বিমলার যৎপরোনাস্তি দুর্বিপাক সংবাদ জানিয়া কই বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছেন না তো; কই সে জন্য উদ্বেগ নাই তো। সরমা পড়িতেছেন, হাসিতেছেন ও বিদ্রূপ পরিহাস করিতেছেন। এ সংসারে যে না কাঁদিবে, তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ সংসার পাপ, তাপ, ক্লেশ, শোক, দুঃখে পরিপূর্ণ। ইহা কাঁদিবারই উপযুক্ত স্থল। এই ঘোর বিষাদ ও যন্ত্রণা রাশি পরিবেষ্টিত বিশ্বধামে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে, তাহার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। সে ব্যক্তি মহৎ। যে না কাঁদিবে তাহাকে কে কাঁদাইতে পারে? এ কথা যথার্থ। কিন্তু সংসারে না কাঁদিয়া কটা লোক থাকিতে পারে? প্রতিহিংসার তীব্র আক্রমণ কে উপেক্ষা করিতে পারে? কৃতান্তের কঠোর শাসন কে হাসিয়া উড়াইতে পারে? যন্ত্রণার জলন্ত শিখায় দগ্ধ হইয়া কে স্থির থাকিতে পারে? অবনীর অসংখ্য আপদে কাহার মস্তক সর্ব্বদা অচঞ্চল থাকে? এ সংসারে না কাঁদিয়া কে থাকিতে পারে? যে বুঝিয়াছে যে দিবারাত্রি ক্রন্দন ধ্বনিতে স্বর্গ মর্ত্ত্য চরাচর বিদারণ করিলেও কৃতান্তের করাল কবল হইতে বিগতজীব সুহৃদের পুনর্জীবন প্রাপ্তি অসম্ভব, যে বুঝিয়াছে যে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে আজীবন কাল প্রজ্বলিত পাবক রাশি প্রতিষ্ঠিত রাখিলেও এ সংসারে মনের বাসনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, যে বুঝিয়াছে যে নেত্র নিঃসৃত অশ্রুবারি সমবেত হইয়া যদি অতি বিস্তৃত জলধি পরিমিত করা হয়, তথাপি জীবনের আশা সম্পূর্ণ হয় না, যে বুঝিয়াছে যে অবক্তব্য চেষ্টা করিলেও যে বিপদের প্রতিবিধান করা মনুষ্য সাধ্যের অতীত তজ্জন্য চিন্তা করা মূঢ়ের কার্য্য, সে সহজে কাঁদে না। সেইরূপ লোককে জগতে সকলেই প্রশংসা করে। তিনিই স্থির, ধীর, শান্ত ও বিবেকী বলিয়া উক্ত হন। জগতে সেরূপ উদার দেবপ্রকৃ-

ঠিক লোকি অল্প। যাঁরা মোহাবৃত মানব হৃদয়ের তদ্রূপ উন্নতি সহজে হয় না। যদি কেহ সে উন্নতির নিকটস্থ হন, তিনি প্রশংসনীয়। সরমার প্রকৃতি অনেকাংশে এইরূপ স্বর্গীয় উদারতার নিকটস্থ। তিনি পাষাণী নহেন। তাঁহার হৃদয় দয়া দাক্ষিণ্যাদি কমনীয় গুণসমূহে পরিপূর্ণ।

সরমা হেমাঙ্গিনীর সহিত পরিহাস করিতেছেন। এত দুঃখের অবস্থায় যাহার মুখে হাসি সে সংসারের অতি আদরণীয় সম্পত্তি।

হেমাঙ্গিনী বলিল,—

"বৌ! তুমি যে বই পড়ছ, আমাকে তাই পড়াবে?"

সরমা বলিলেন,—

"এ বই বিয়ের পর বরের কাছে পড়তে হয়।"

"তবে আমার বিয়ে হউক।"

"কার সঙ্গে?"

"যার সঙ্গে হয়।"

"আমার সঙ্গে?"

"দূর!"

"কেন?"

"মেয়ে মানুষে মেয়ে মানুষে কি বিয়ে হয়?"

"তবে রাঙ্গা বর খুঁজতে বলি।"

হেমাঙ্গিনী নীরব। সরমা বলিলেন,—

"আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি তোমায় পুতুল খেল্‌তে দিব।"

"কেন, আর কারও সঙ্গে বিয়ে হলে খেলা করতে দেবে না?"

"না।"

"কেন?"

"বরকে যে মান্য করতে হয়। তাঁর ইচ্ছায় চল্‌তে হয়।"

"বর কি মারে?"

সরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—

"না। বর ভালবাসে, আদর করে।"

"মিথ্যা কথা। তা হলে বর আমাকে খেলা করতে, আমোদ করতে, দেবে না কেন?"

"যে তোমাকে ভাল বাসে, তুমি তাকে ভাল বাস না ?"

"বাসি ; তোমাকে, দাদাকে, মাকে আমি সবাইকে ভাল বাসি।"

"তোমার বর তোমাকে ভাল বাস্‌লে তুমি তাঁকে ভাল বাস্‌বে ?"

"বাস্‌ব।"

"যাতে বর খুসী হন, তা না করলে তোমার ভাল বাসা হলো কই ?"

"আমি যাতে খুসী হই তা না করলে বরেরই বা আমাকে ভাল বাসা হলো কই ?"

সরমা মনে মনে বলিলেন,—

"প্রণয়ের প্রথম কথা কাহাকেও শিখাইতে হয় না। কি আশ্চর্য্য! কিন্তু বঙ্গদেশ—"

অপর প্রকোষ্ঠে পদধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ কেশব সরমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কেশবের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসরের ন্যূন নহে। তাঁহার দেহ পূর্ণ ও আয়ত, বক্ষ বিশাল, বাহুদ্বয় মাংসল, লোচন যুগল উজ্জ্বল ও বুদ্ধি-প্রকাশক। বদন সুন্দর—সাহস, ভদ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ব্যঞ্জক।

কেশব বিদ্বান্‌। ভদ্র ও অমায়িক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ও তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র। লোকের বিপদ বা সম্পদ উভয় অবস্থাতেই কেশব অগ্রসর। কেশবকে দেখিয়া বোধ হয় যে, ধন ও বিদ্যা এক সঙ্গে থাকিতে পারে না, এ কথা মিথ্যা। কেশব অপেক্ষা ধনে রামনগরে অনেকে প্রধান। কিন্তু কেশবের প্রতি সাধারণের যেরূপ অনুরাগ সেরূপ আর কাহারও প্রতি আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেশবের নিরহঙ্কার, অমায়িকতা, ভদ্রতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিই তাহার কারণ। কেশবের সাহসও বড়। যে কার্য্যে লোকে ভয়ক্রমে হস্তক্ষেপ করে না, কেশব আবশ্যক হইলে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কেশব গৃহ মধ্যে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সরমা! কি হইতেছে ?"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তোমার ভগ্নীর বিবাহের পরামর্শ হচ্ছিল।"

হেমাঙ্গিনী পুত্তলীর বাক্স ফেলিয়া এক দৌড়ে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। কেশব হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"তা কি স্থির হলো?"

"ও বিবাহ করবে না।"

"কেন?"

"ও প্রণয় চায়! পুরুষ তো ভাল বাসিতে জানে না।"

কেশব হাসিয়া বলিলেন,—

"ভেবে ভেবে খুব স্থির করেছ তো!"

সরমা গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন,—

"একি মিছে কথা?"

কেশব সরমার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

"হাঁ, তা কি হতে পারে। তোমার মুখের কথা আর বেদ একই।"

সরমা বদনে কাপড় দিয়া হাসিলেন।

কেশব কহিলেন,—

"যোগেশের কি অন্যায় দেখ দেখি। বিমলার সেই সংবাদ দিল, আর তো কিছু লিখিল না! কি জানি কি হইল। আমি তো বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। রুদ্রকান্ত বড় দুষ্ট লোক। কি করি বল দেখি?"

সরমা বলিলেন,—

"তুমি একটী লোক পাঠাও।"

কেশব কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"না, লোক পাঠাইলে হইবে না। কাল প্রাতে আমি স্বয়ং যাইব স্থির করিয়াছি।"

সরমা কহিলেন,—

"আমি অনেক দিন তাঁহাদের দেখি নাই। আমিও তোমার সঙ্গে যাই না কেন?"

"না, এ সঙ্গে তোমার গিয়ে কাজ নাই। তুমি বরং পরে যাইও। আমার বড় ভাল বোধ হইতেছে না।"

সরমা বলিলেন,—

"কি জানি।"

"কাল আমার সহিত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে যতদূর জানিতাম সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, 'অবন্তীপুরের জমীদার বড় মন্দ লোক। এ ব্যাপারে তাহার কোন চক্রান্ত আছে বোধ হয়।' কথাটী আমার মনে লাগিয়াছে। আমি বড় অস্থির হইয়াছি। কালি প্রাতে যাই, কি বল ?"

সরমা বলিলেন,—

"তুমি একা গিয়ে ছাই হবে, কাজ হবে। আমি সঙ্গে থাকুলে সব কাজ হতো।"

"এ কথা আমি অস্বীকার করি না। এ হৃদয়ে তুমি বুদ্ধি, এ দেহে তুমি প্রাণ, তা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি।"

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তবে বুদ্ধি প্রাণ ছেড়ে ভেড়াকান্ত হয়ে গেলেই কি, না গেলেই কি ?"

"এবারে না হয় তোমার বুদ্ধি একটু ধার করে নিয়ে যাব।

"তবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না। সাধে কি বলি যে পুরুষে ভাল বাস্‌তে জানে না। আমি সঙ্গে না গেলে তুমি বাঁচ, তাই যাও।"

কেশব সরমাকে আলিঙ্গন করিলেন। সরমা ভুজ-লতা-দ্বারা কেশবের গলদেশ বেষ্টন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে কেশব দৌবারিকাদি সঙ্গে লইয়া পাল্কী করিয়া রামনগর যাত্রা করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নূতন জীবন।

দিবা দ্বিপ্রহর কালে রৌদ্র চম্ চম্ করিতেছে। আশ্রয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া ক্লেশকর। হরিপাড়া গ্রাম যেন জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। জনপ্রাণী সকলেই ছায়াতলে শয়ন করিয়া শ্রান্তি লভিতেছে। গ্রামের এক পার্শ্বে আম্র, কাঁটাল, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি বিস্তর বৃক্ষের ঝোপ। সেই উদ্যান বা বন মধ্যে এক খানি সুপরিষ্কৃত খড়ের ঘর। গৃহস্বামীর গুণে সেই বাগান বা বন সুপরিষ্কৃত, নির্ম্মল ও ঝরঝরে। ঘর খানির অবস্থা আরও প্রশংসনীয়। ঘর খানি এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এমনি সুরুচি-সম্পন্ন যে, অতি মনোরম সৌধ ত্যাগ করিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত সেই ঘরের দাবায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে সাধ যায়।

সেই ঘরের মধ্যে একটী সুপরিষ্কৃত সামান্য শয্যায় একজন নিদ্রা দিতেছিল। শয্যার অনতিদূরে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। সেই সুন্দরী মনোরমা। মনোরমা ক্ষণেক পরে পুস্তক রাখিয়া দিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তিরও নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। এই নিদ্রিত ব্যক্তি আমাদের চিরপরিচিত যোগেশ! যোগেশ এখানে? ঘটনাচক্রে আবর্ত্তিত হইয়া যোগেশ এই অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে সমাগত। এ ব্যাপারে কিছুই বিচিত্রতা নাই। পাঠক, আপনি বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন না। যোগেশ রুগ্ন, ক্লিষ্ট, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। তিনি উঠিয়া বসিলেন; দেখিলেন মনোরমা বসিয়া আছেন। সস্নেহে কহিলেন,—

"ভগ্নি! তুমি সেই অবধি নিয়ত এই খানেই বসিয়া আছ?"

মনোরমা বলিলেন,—

"হাঁ।"

যোগেশ কহিলেন,—

"ভগ্নি! তোমার এই স্নেহ অতি অমূল্য সম্পত্তি। আমি তো মরিয়াই

গিয়াছিলাম। প্রান্তর মধ্যে আমার পাল্কি রাখিয়া বাহকেরা বিশ্রাম করিতে গেল, তৎপরে কে আমায় গুরুতর আঘাত করিল, আর আমি কিছু জানি না। পরে যখন আমার চেতনা হইল, আমি শুনিলাম হরিপাড়ায় রহিয়াছি। দেখিলাম তোমার ও নরেন্দ্রের স্নেহ আমার জীবনে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। ভগ্নি! তুমি আমাকে এত যত্ন কেন করিতেছ? আহার নিদ্রার অন্যথায় তোমার পীড়া হইতে পারে। আমি তো সুস্থ হইয়াছি। আমার জন্য এখন তো আর কোন চিন্তা নাই।"

যোগেশ দেখিলেন মনোরমার চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। সবিস্ময়ে কহিলেন,—

"মনোরমা কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

মনোরমা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—

"এ জীবনে কেহ আমার সহিত এমন আদর করিয়া কথা কহে না।"

কথাটী যোগেশের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি! তুমি বল যদি, তবে আজি একটী কথা তোমায় মনে করিয়া দি।"

মনোরমা বলিলেন,—

"বল।"

যোগেশ কহিলেন,—

"যখন প্রথমে আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিলাম আমার শয্যার এক পার্শ্বে তুমি, অপর পার্শ্বে নরেন্দ্র বসিয়া প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতেছ। তোমরা আমার জন্য যেরূপ যত্নশীল ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, ভাই ভগ্নী ততদূর হয় না। আমি অবাক হইলাম। সকলই স্বপ্ন বোধ হইতে লাগিল। কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি, তাহা কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক এ বিস্ময় অধিকক্ষণ থাকিল না। অতি অল্প কথায় নরেন্দ্র আমাকে সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন। আমি সেই দিন হইতে তোমাকে সোদরাপেক্ষা স্নেহ ও আপন জ্ঞান করি। নরেন্দ্র সংক্ষেপে আমাকে আত্মপরিচয় দিলেন। তোমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তুমি কাঁদিতে লাগিলে। আমার বড়

কৌতুহল রহিল, বড় দুঃখ হইল। পাছে তোমার চক্ষু দিয়া আবার জল পড়ে এই ভয়ে আর ও কথা তুলিলাম না। এই ব্যাপারের পর আমার বড় জ্বর হয়। নরেন্দ্র কি কার্য্যে গিয়াছিলেন, তুমি আমাকে ঔষধ খাওয়াইতে আসিলে। আমি বলিলাম, ভগ্নি! আমাকে আত্ম বিবরণ না জানাইলে আমি কদাচ ঔষধ খাইব না। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলে যে, আমার জ্বর সারিলে তুমি সমস্ত কথা বলিবে। এখন তো আমার জ্বর সারিয়াছে। বল, আজ আমায় সেই কথা বল। তুমি আমাকে আপন বিবেচনা কর তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তবে ভগ্নি! আমাকে না বলিবে কেন?"

মনোরমা ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বলিলেন,—

"বলিব, ভ্রাতঃ! তোমাকেই বলিব। আমার শোকাবহ কথা শুনিবার তুমিই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।"

যোগেশ আরও কৌতূহলী হইলেন।

মনোরমা বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু আমি বড় হতভাগিনী। ভয় হয় পাছে সমস্ত কথা শুনিয়া তুমিও আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা কর, আমার সহিত সাদরে কথা না কও, আমাকে দেখিলে মুখ ভার কর। আমার কপাল বড় মন্দ।"

যোগেশ বলিলেন,—

"মনোরমে! তোমার কাহিনীতে এমন কিছুই থাকিতে পারে না, যে জন্য তোমাকে ঘৃণা করা যায়। তোমার চরিত্রে দোষ থাকা অসম্ভব। তবে যদি তোমার কাহিনীতে সেরূপ থাকে, নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকে সাহস দিতেছি যে, তজ্জন্য আমার স্নেহ, মমতা একটুও টলিবে না, এক কণাও ভাঙ্গিবে না। মনোরমা! কি বলিবে বল।"

মনোরমা উন্মাদিনীর ন্যায় অস্থিরতা সহকারে স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়দিগের সুবিধার জন্য আমরা তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

মনোরমা বাল্যকালেই পিতৃহীনা। জননী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। দরিদ্র তনয়া মনোরমা ও তাঁহার জননী কথঞ্চিৎরূপে জীবিকাপাত করিতেন। অতি অল্প আয়ে পল্লিগ্রামে জীবিকা নির্ব্বাহিত

হইতে পারে। কায়ক্লেশে মনোরমার মাতা তাহা সংগ্রহ করিতেন। মনোরমার যখন আট বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পাত্রস্থা করিলেন। মনোরমার জন্য চিন্তা হইতে তিনি অবসর পাইলেন মনে করিলেন। কিন্তু সকলই বিপরীত হইল। এক বৎসরের মধ্যে মনোরমার স্বামী বিগতজীব হইলেন। মনোরমা বাল বিধবা। মোমের পুতুল মনোরমার যত্ন হইল না। লতিকা ভূমে লুটাইতে লাগিল। মনে সুখ নাই, কিন্তু স্বাভাবিক শোভা কোথা যাইবে? যৌবনোদয়ে মনোরমার অতুল সৌন্দর্য্য ভুবনমোহন হইয়া উঠিল।

বলরামপুর প্রভৃতি গ্রামে বরদাকান্ত রায়ের জমিদারী ও নীলকুঠি ছিল। সেই জন্য রুদ্রকান্ত রায় মধ্যে মধ্যে বলরামপুর আসিতেন। ঘটনাক্রমে মনোরমার ভুবনমোহন রূপ সেই কাণ্ড জ্ঞান বিরহিত যুবকের নেত্র পথে পতিত হয়। মনোরমা সম্বন্ধে রুদ্রকান্তের মনে নিরতিশয় কদর্য্য লালসা উদিত হয়। হিতাহিত বোধ বিহীন রুদ্রকান্ত পবিত্রহৃদয়া বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধন, সম্পত্তি ও প্রভুত্বার দ্বারা কোন্ কার্য্য না সম্পন্ন হইতে পারে? সহায়-সম্পত্তি বিহীনা, অনাথিনী বালিকার কাকুতি মিনতি, রোদন সমস্তই হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল। বলপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। চিরদিনের নিমিত্ত সরল পবিত্র হৃদয়ে গরল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ঘোর বিষাদ সমুদ্রে তাহার নিঃসহায় জীবন-তরণী ভাসাইয়া দেওয়া হইল। তাহার সমস্ত সুখের মূলে বিষম কুঠারাঘাত করা হইল। বালিকার নিমিত্ত চিরজীবন রোদন, অন্তর্দাহ ও মর্ম্মবেদনা ব্যবস্থা করা হইল। হায়! ধন ও প্রভুতা গর্ব্বে গর্ব্বিত অবিবেকী পশুবৎ মানবগন সংসারে কি অত্যাচারই না করিতেছে!

মনোরমার চৈতন্যের উদয় হইল। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার আয়োজন করিলেন। এ কলঙ্কিত দেহ রাখিবেন না স্থির করিলেন। মৃত্যু স্থির করিয়া নিভৃত গৃহে মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে গলদেশে ফাঁস দিলেন। লম্বিত হইবেন এমন সময় ঘরের রুদ্ধ দ্বার ঘোর শব্দ সহকারে উন্মুক্ত হইল। এক জন লোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি মনোরমাকে মরিতে দিলেন না। সেই এক জন মনোরমার বাল্য-সহচর চির-

পরিচিত ও পরম হিতৈষী নরেন্দ্র। নরেন্দ্র মনোরমাকে মরিতে দিলেন না। নরেন্দ্রের কথা রহিল—মনোরমা মরিতে পাইলেন না। নরেন্দ্র সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের সহিত চিরকালের ভালবাসা। নরেন্দ্রের এতাদৃশ যত্নে, এতাদৃশ শুভানুধ্যানে সেই ভালবাসা আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যৌবনে সেই প্রেম গাঢ় বেশ ধারণ করিল। নরেন্দ্র দুঃখিত হইবেন ভাবিয়া মনোরমা এককালে মরিবার বাসনা মন হইতে বিসর্জ্জন দিলেন। শেষে নরেন্দ্রের সন্তোষ সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। উভয়ের হৃদয়ে প্রেম-প্রবাহ সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। উভয়ে প্রণয়-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"জগতে মনোরমা ভিন্ন আর কাহাকেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন না।" মনোরমাও বলিলেন,—"সংসারে নরেন্দ্রই তাঁহার সর্ব্বস্ব।" সংসারে যাহাই হউক, নরেন্দ্র-মনোরমা অভ্যন্তরে অভেদাত্মা। তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ, উচ্চ, উদার ও পবিত্র প্রণয় অধিষ্ঠিত।

যোগেশ সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন,—

"মনোরমে! ভগ্নি! তোমার কথা শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি। যেমন করিয়া হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি স্বহস্তে রুদ্রকান্তের এ ঘোর দুষ্কৃতির প্রতিফল দিব। আর ভগ্নি! তুমি এজন্য এতাদৃশ সঙ্কুচিতা কেন? ইহাতে তোমার অপরাধ কি? অত্যাচারী, জ্ঞানহীন, পশুবৎ জঘন্য জীবের দুষ্কৃতির জন্য তুমি কখনই দায়ী নহ। তোমার অপরাধ কি? এজন্য যে তোমার অপরাধ দেয় নিশ্চয় জানিও সে মূর্খ। সমাজের নিয়মে যদিও ইহাতে তোমাকে দোষী করে, জানিও সে নিয়ম নিরতিশয় ভ্রান্তিমূলক। এই কারণে আমি তোমাকে ভ্রমেও ঘৃণা বা অনাদর করিব না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। ভগ্নি! কেন তুমি কষ্টে নিজ অন্তর সন্তাপিত কর? ইহাতে তোমার দোস কি? আমি বলিতেছি, ইহাতে কোনই অপরাধ নাই।"

মনোরমা অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার লোচন দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু পড়িল। যোগেশ আবার বলিলেন,—

"মনোরমে! কাঁদিতেছ কেন? তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। মনোরমা তুমি কাঁদিও না।"

মনোরমা ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"সংসারের সকল লোক যদি আমার উপর তোমার মত সদয় হইত!"

যোগেশ বড় দুঃখিত হইলেন। বলিলেন,—

"সংসারের লোকের কথায় তোমার কাজ কি মনোরমা? সংসারের সকল লোকের হৃদয় কি কখন একরূপ হয়? মনোরমা তুমি মানুষ চেন না। সংসারের জন্য চিন্তা করিও না। আমায় বল, আর চক্ষের জল ফেলিবে না?"

মনোরমা বলিলেন,—

"না।"

এই সময় নরেন্দ্র আসিয়া ব্যস্ততা সহকারে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—

"কি হইতেছে?"

যোগেশ তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সংবাদ।

কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? তুমি মনুষ্য, প্রভুতা, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধরণীকে তৃণবৎ মনে করিতেছ, কিন্তু তুমি জান কি, এখনই তোমার এ গর্ব্বের কি পরিণাম ঘটিতে পারে? মনুষ্য এ সংসারে, অন্ধকার গৃহ মধ্যে বিহঙ্গমের ন্যায়, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জানে না কোন্ দিকে পথ, বা কোন্ দিকে প্রতিবন্ধক। মনুষ্য যাহা মনে ভাবিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, হয়ত তাহা হইতেছে না, নয়ত বা ঘটিয়া যাইতেছে। কিন্তু স্থির কি? তুমি যাহা স্থির ভাবিতেছ,

তাহা তো স্থির নয়; সকলই অস্থির। ব্যবসায়ি! অর্থাগমের উপায় অন্বেষণার্থ তুমি কতই ফাঁদ পাতিতেছ; যশার্থি! স্বকীয় নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি মানব-বদনে অহর্নিশ সমুচ্চারিত শুনিতে কতই চেষ্টা করিতেছ; প্রেমিক! প্রণয়ের পূত ভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া প্রণয়িনীর পীযূষ পূরিত মুখারবিন্দ অতৃপ্তনয়নে অনন্তকালের নিমিত্ত সন্দর্শন করিবার আশায় সংসারের সমস্ত বিপদ তুমি বিদলিত ও উপেক্ষা করিতেছ; বিদ্বান্! বিদ্যার নির্ম্মল সলিল রাশির উপরে নিরন্তর অকাতরে এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সন্তরণ দিবার নিমিত্ত তোমার চিত্ত নিয়ত ব্যাকুল রহিয়াছে; কিন্তু তোমরা জান কি, তোমাদের এ সকল চেষ্টার কি পরিণাম হইবে? এত সাধে কি বাদ জুটিবে, তাহা কে জানে? কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? আশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সকলই বলিতেছে বাসনার ষোল কলা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কই, তা হয় কই? কই, মনের আশা মিটে কই? মনের সাধ মনে মনে রহিয়া যায়, তাহা সফল হয় কই? এ জগতে কাহার আশা মিটিয়াছে? কে বলিয়াছে আকাঙ্ক্ষার সীমা দেখিয়াছি? আলেকজণ্ডর বলিলেন,—"জগতে আর এমন রাজ্য নাই যে, আমি অধিকার করি।" নিউটন বলিলেন,—"বিদ্যা সমুদ্র যেমন তেমনি আছে, আমি কেবল তাহার তীরস্থ লোষ্ট্র সঞ্চয় করিয়াছি।" আর্কিমিডিজ বলিলেন,—"কোথাও এমন স্থান নাই যে, আমি তথায় স্ক্রু যন্ত্র স্থাপন করিয়া পৃথিবীটাকে সরাইয়া দি।" আর কাহার কথা বলিব? কাহার সাধ মিটিয়াছে, কাহার আশা সফল হইয়াছে? কে বলিবে যে, আমি জগতে মনের বাসনা মিটাইয়া চলিলাম। ভ্রান্ত আশার প্রতিপদে বিঘ্ন। বাসনার বিস্তর বাধা। তুমি যাহা স্বপ্নেও ভাব নাই, ভ্রমেও মনে স্থান দেও নাই, এমন অননুভূতপূর্ব্ব অভ্যাগত বিপদ সমুপস্থিত হইয়া তোমার সমস্ত আশা স্রোতের জলে ভাসাইয়া দিতে পারে, তোমার সমস্ত সাধে বিষাদ ঘটাইয়া দিতে পারে, তোমার সমস্ত বাসনার মুখে গরল ঢালিয়া দিতে পারে, তোমাকে জীবন্মৃত করিয়া দিতে পারে। কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? ব্যবসায়ি! হয়ত তোমার কার্য্যের অভ্যন্তর অসাবধানতা কীটে এমন জর্জ্জর করিতেছে

যে, সহসা তোমার সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়া গিয়া এক দিনে, তুমি পথের ভিখারী হইতে পার। যশার্থি! তোমার অজ্ঞাতসারে তোমারই নিকটে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ এরূপ এক ব্যক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এক দিনেই তাহার নাম, তোমার সমস্ত আশা ভরসা অতল জলে নিলীন করিতে পারে। প্রেমিক! তোমার জীবন সর্ব্বস্বের অনুরাগ ও উপেক্ষা হয়ত তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাকে চির-কালের নিমিত্ত অসার ও নীরস করিয়া দিতে পারে। বিদ্বান্! বিদ্বেষের তীব্র আক্রমণে তোমার অন্তরকে হয়ত চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য করিয়া দিতে পারে। সর্ব্বোপরি মৃত্যু আসিয়া সকল সময়েই আমাদের সকল বাসনার শেষ করিয়া দিতে পারে। তবে, কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? কালিকার কথা আজি কেহ বলিতে পারে না বলি-য়াই তো সংসারে এত গোল ও এত অসুবিধা। কালিকার কথা আজ কেহ বলিতে পারে না, বলিয়াই তো আজ, অবন্তীপুরের যোগেশ হরিপাড়ায় অপরিচিত আত্মীয়গণের মধ্যবর্ত্তী। কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে? যোগেশ কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছিলেন, কিরূপ বিপদে ও কিরূপ ঘটনায় এই অচিন্তিতপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত! কোথায় প্রাণাধিকা বিমলার সন্ধানার্থ যোগেশ মাথায় সাপ বাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, না কোথায় অজ্ঞাত ব্যক্তির বিষম আঘাতে মৃতপ্রায়! যোগেশ সে আঘাতে মরিলেন না বটে, কিন্তু তখন তাঁহার অবস্থা মৃতবৎ হইল। যাহার আঘাতে দেহের এই অবস্থা ঘটিল সে পলাতক হইল। যাহারা কোন দোষে দোষী নহে সেই বাহকগণ অন্ধকার রাত্রে দেহ বহন করিয়া হরিপাড়ার নীচে গঙ্গায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর যাহাদের সহিত কখন দেখা সাক্ষাৎ, বা কোন প্রকার পরিচয় নাই, তাহারা তাহা যত্নে তুলিয়া লইল। এ সকলই বিচিত্র ব্যাপার। তাই বলি, এ সংসারে কালিকার কথা আজি কে বলিতে পারে?

বলা বাহুল্য নরেন্দ্র মনোরমার সহিত যোগেশের যৎপরোনাস্তি, আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। যোগেশ এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। যোগেশ নরেন্দ্রকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

নরেন্দ্র যোগেশকে ভদ্রতার উচ্চ আদর্শ জানিয়া স্বীয় মনের মধ্যে প্রবেশ অধিকার দিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাতে মনোরমাও ঐ উপযুক্ত বন্ধুকে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা জানাইয়াছেন। মনের বেদনা মনে পুষিয়া রাখা বড় বালাই। এ সংসারে উপযুক্ত পাত্রে বেদনা ঢালিয়া দেওয়াই ভাল। একের ভারের অন্যে যদি অংশ লয়, তাহাতে হানি কি? মনোরমা মনের কথা যোগেশকে বলিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উপকারই হইয়াছে। যোগেশ তাঁহাকে পরম সমাদর করিয়াছেন, ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মনোরমার আনন্দের সীমা নাই।

সায়ংকালে যোগেশ সেই ঘরের দাবায় একখানি মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার শরীর বেশ সারিয়াছে বটে, তবে এখনও কতকটা দুর্বলতা আছে। যোগেশ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে অক্ষম। একবার এদিকে হেলিতেছেন, একবার ওদিকে ঝাঁকিতেছেন, একবার উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আবার বসিতেছেন। তিনি নিতান্ত অস্থির। বলরামপুরের কুঠিতে রুদ্রকান্ত ও রামকৃষ্ণ আসিয়াছেন, এবং সেখানে রামকৃষ্ণের বিবাহ হইবে এইরূপ একটা সংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। কথাটা কি জানিবার নিমিত্ত নরেন্দ্র নিজে বলরামপুর গমন করিয়াছেন। এই জন্যই যোগেশ এত অস্থির। কথাটা সহজ নহে তো। বিমলা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর দূরে এরূপে লুকাইয়া রামকৃষ্ণের বিবাহের আয়োজন—বড়ই ভয়ানক কথা সন্দেহ কি?

নরেন্দ্র তখনই ফিরিয়া আসিলেন। জনরব অমূলক নহে। নরেন্দ্র জানিতে পারিয়াছেন, অদ্য রাত্রে রামকৃষ্ণের বিবাহ হইবে। পাত্রীর বিশেষ বৃত্তান্ত তিনি জানিতে পারেন নাই।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া যোগেশ স্থির বুঝিলেন, বিমলাই এই বিবাহের পাত্রী। তাহার পর তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়া উঠিল তাহার আর কি বলিব? তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তখনই একাকী বলরামপুরের কুঠিতে গিয়া বিমলাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ধাবিত

হইলেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে জোর করিয়া সে চেষ্টায় বিরত করিলেন। তিনি বলিলেন।

"ব্যস্ত হইবেন না। উতলা হইয়া সকল দিক নষ্ট করিবেন না। একার কর্ম্ম নহে। আপনি আমি দুজনে তাহাদের কি করিতে পারিব?"

তখন যোগেশ কহিলেন,—

"কেশবের নিকট কখন লোক পাঠাইয়াছ?"

"অদ্য প্রাতে।"

"সে লোক কতক্ষণে রামনগরে পঁহুছিয়াছে?"

"দ্বিপ্রহরের মধ্যে।"

"সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যদি কেশব যাত্রা করেন, তাহা হইলে কতক্ষণে এখানে আসিয়া পঁহুছিবার সম্ভাবনা?"

"সন্ধ্যার মধ্যে।"

"সন্ধ্যা তো হইয়া গেল। কেশব তো আসিলেন না।"

"বোধ হয়, এখনই আসিবেন।"

বলিতে বলিতে বাহিরে বালকগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দ শ্রবণ করা গেল। নরেন্দ্র ও যোগেশ ব্যস্ততা সহকারে বাহিরে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-আয়োজন।

অদ্য বলরামপুরের কাছারি বাটীতে অনন্দের সীমা নাই। তথায় অদ্য রজনীযোগে এক সমারোহের বিবাহ হইবে। বিবাহের পাত্র রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, পাত্রী বিমলা। বরকর্ত্তা স্বয়ং রুদ্রকান্ত রায়। সকলেই অনন্দ-সাগরে মগ্ন। রামকৃষ্ণ অদৃষ্টে এমনও ছিল ভাবিয়া খুসী—রুদ্রকান্ত অত্যাচারের চূড়ান্ত হইবে ভাবিয়া খুসী—লোক জন যা হবার নয় তাই হইল ভাবিয়া খুসী। মামা ঠাকুরের বিবাহ—স্বপ্নের অগোচর কথা। রূপের হোঁদলকুতকুতে মামা ঠাকুরের বিবাহ হইবে—যেমন তেমন বিবাহ নয়, সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরার সঙ্গে, সুতরাং অনুজনবর্গ মহা খুসী। ফল, কাছারি আনন্দে তোলপাড়। এত আমোদ, এত আনন্দ মধ্যে কেবল এক জন বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে। সে এক জন বিমলা। বিমলা কাঁদিতেছেন, তা আমার কি? সংসারে কত লোক কত সময় কাঁদিয়া থাকে। সকলের কান্না দেখিতে গেলে চলে না। যার ইচ্ছা হয় সে কাঁদুক। তা বলিয়া আমরা আপন কাজ ছাড়িব কেন? যে কোন রূপে আত্ম কার্য্য উদ্ধার করা চাই। এখন বিমলার রোদন দেখে কে? বিমলার ইচ্ছা আছে কি না আছে, তাহাই বা জানিবার দরকার কি? সংসারে কোন কার্য্যই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় না। বিশেষতঃ পাত্রীর মত লইয়া বিবাহ কোথায় হয়? আর পাত্রীর মত না থাকিলেই কি বয়ে গেল? সুতরাং বিমলা কি করিতেছেন সে জন্য কেহ চিন্তিত বা কাতর নহে। সে দিকে কাহার লক্ষ্যও নাই।

কাছারি ঘরের পার্শ্বস্থ বৈঠকখানা ঘরে রুদ্রকান্ত ও চারিজন বয়স্য বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও মদ্যচর্চ্চায় রত রহিয়াছেন। এমন সময়ে সম্মুখের দ্বারসংলগ্ন সবুজ রঙ্গের পরদা একটু খানি সরিয়া গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া একটী কৃষ্ণ বর্ণের কূপা বা জালা প্রবেশ করিতেছে বোধ হইল। বিশেষ অনুধাবনে বুঝা গেল, সেটী কূপা বা জালা নহে।

তাহা কথঞ্চিৎ মনুষ্যের উদর সদৃশ। একে একে হস্ত পদাদি সমস্তই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। ভাবতের সম্মিলনে যে অদ্ভুত জীবের উদ্ভব হইল, তাহার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। রামকৃষ্ণের হরিদ্রা বর্ণের দন্ত আজ্ আর ঢাকিতেছে না। আজ্ তাঁহার অধরোষ্ঠ ভেদ করিয়া হাস্যের তরঙ্গ বাহির হইতেছে; যেন গোমুখী হইতে গঙ্গার উদ্ভব হইতেছে। রামকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। এক জন বয়স্য বলিলেন,—

"মামা! তোমার আজ পাথরে পাঁচ কিল বাবা!"

রামকৃষ্ণের দন্ত আরও বাহির হইল। হাসি আকর্ণ বিশ্রান্ত হইল। রামকৃষ্ণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। বুঝি কথাটায় একটু লজ্জা হইল। কহিলেন,—

"আঁ—হাঃ, হাঃ; য়্যাঃ—"

রামকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন। এক জন বয়স্য রুদ্রকান্তকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"লগ্ন কত রাত্রে?"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"রাত্রি ৭ টার পর যখন ইচ্ছা।"

"অনেক রাত্রে বিবাহ দেওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—

"কেন—কেন—য়্যাঁ।"

"এদিকে একটু আমোদ প্রমোদ করে শেষাশেষি বিবাহ হওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"তা কেন? আমার শরীর খারাপ—তা বিবেচনা কর—তোমার যে উল্টা কথা।"

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"বিলক্ষণ মামা! তুমি কার কথা শুন্‌ছ? সন্ধ্যা হইলেই শুভ কর্ম্ম শেষ কর্ত্তে হবে!"

রামকৃষ্ণের শ্রীবদনারবিন্দে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দেড় কাঠা হাসি বাহির হইল। কহিলেন,—

"তা তো বটেই।"

একজন বয়স্য জিজ্ঞাসিলেন,—

"আচ্ছা মামা সবই তো স্থির। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে তোমার বিবাহ হবেই হবে। কিছুতেই এ আর রদ হয় না। তুমি সত্য করে বল দেখি বাবা, এখন তোমার মনের অবস্থা কি রকম?"

এবার রামকৃষ্ণের মধুর হাসি এত বাড়িয়া গেল ও শ্রীমুখ এত ফাঁক হইল যে কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। অন্য কোন উত্তর না দিয়া তিনি কেবল বারদ্বয় বিকট গর্দ্দভবৎ "আঁ—আঁ" শব্দ করিয়া উঠিলেন।

বয়স্য পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন,—

"বল্লে না মামা। ছি বাবা, আমাদের কাছে লুকোচুরি!"

রামকৃষ্ণ দেখিলেন কথাটার জবাব দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং চেষ্টা করিয়া মুখ বন্ধ করিলেন। ক্ষণেক ভাবিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব হাসির সহিত মিশাইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠে রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"আমার প্রাণটা যেন আজ্ ভো কাটা ঘুড়ির মত লোট খেতে খেতে পড়ে যাচ্চে। লুটে নিলেই হয়।"

সকলে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল,—

"মামার রস দেখেছ?"

রামকৃষ্ণ আবার বলিতে লাগিলেন,—

"সত্তি বাবা। আমার শরীরটে যেন আজ্ গলে জল হয়ে গিয়েচে। আমি যেন কোথায় রইছি।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"মামার যে মনোরথ আজ্ সিদ্ধ হলো এ আমার বড় আনন্দ। মামা আজ্ মন খুলে ফুর্ত্তি কর বাবা।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"ফুর্ত্তিতে আমি যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছি। আমার ইচ্ছে হচ্চে তোমায় কোলে করে নাচি।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। একজন বয়স্য রুদ্রকান্তকে সম্বোধন

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

করিয়া কহিলেন,—

"আমাদের আনন্দ কম, নয়। বিশেষ আহারটা পরিপাটী রকম হবে।"

রুদ্রকান্ত বলিলেন,—

"জায়গাটা বড় খারাপ। আহারের আয়োজনটা বড় সুবিধা মত হয় নাই।"

আর একজন কহিলেন,—

"সে কি কথা? ওটার তদ্বির বড় আবশ্যক।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"সে যা হয়েছে তা হয়েছে, তার জন্য আটকাবে না।

বয়স্য বলিলেন,—

"বিলক্ষণ। তোমার এই কথাই বটে?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"তা বই কি? আহার যৎকিঞ্চিৎ হলেই হল। শুভ কর্ম্মটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়া নিয়ে কথা।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাবাজি তুমি কিছু জল টল খাওগে। এর পর সময় পাবে না।"

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—

"সে কি মামা, এখনও ছুই বাজে নাই। এই তো আহার করা গেল।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন,—

"আরে নাহে না। তোমার ভুল হয়ে থাকবে।"

রুদ্রকান্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখাইলেন।

রামকৃষ্ণ কহিলেন,—

"ঘড়িটা ঠিক চল্‌ছে তো?"

রুদ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—

"বিলক্ষণ!"

রামকৃষ্ণ একটু দুঃখিত হইয়া নীরব হইলেন।

কুঠির একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আসিয়া নিবেদন করিলেন,—

"বিবাহ স্থানের যে ব্যবস্থা করা গেল, একবার আসিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

রুদ্রকান্ত গাত্রোত্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও চলিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিবাহ রাত্রি।

সন্ধ্যা উপস্থিত প্রায়। বিবাহ অল্প রাত্রেই হইবে স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর বিলম্ব নাই। লোক জন সকলেই ব্যস্ত। রামকৃষ্ণ আহ্লাদে ফুটি কাঁকুড়। রুদ্রকান্ত অস্থির। কাছারি বাটী লোকের স্বরে প্রতিধ্বনিত।

বৈঠকখানার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রোসন চৌকি লক্ষ্ণৌ ঠুংরি বাজাইতেছে। কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া তাহা শুনিতেছে। রুদ্রকান্ত বাবু নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং নিয়মিত রূপে শুনিতে পাইতেছেন না। শুনিতে পাইতেছেন না, তাহা নহে। তিনি যখন যে স্থানে রহিয়াছেন তথা হইতে তাহা বেশ শুনা যাইতেছে; তথাপি তিনি শুনিতে পাইতেছেন না। তাঁহার শুনার অর্থ অন্যবিধ। তিনি কিছুই বুঝেন না, তাঁহার কোনই জ্ঞান নাই। তথাপি তাঁহার হাত নাড়া চাই, অসময়ে করতালি দেওয়া চাই এবং পার্শ্বস্থ ব্যক্তির, বিশেষতঃ রোসনচৌকী ওয়ালার সেলাম করিয়া বলা চাই যে, বাবুর বোধশক্তি বড়ই ভারি। তিনি এই সকল শুনিতে পাইতেছেন না। যাহা হউক কোন প্রকারে একটু অবকাশ করিয়া বাবু বাদ্য স্থলে "আহা হায়" শব্দে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলার চীৎকারে

বাদ্যের বিঘ্ন জন্মিল। বাদকেরা থামিয়া বাবুকে সেলাম করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল,—

"আঃ বাবু আসিয়াছেন, আমরা বাজাইয়া বাঁচি!"

বাবু হাসিতে লাগিলেন। বাদকেরা পুনরায় অন্যবিধ বাদ্য আরম্ভ করিল। এমন সময় রামকৃষ্ণ ব্যস্ততা সহ সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রুদ্রকান্তকে কহিলেন,—

"সেকি বাবাজি তুমি বাজনা শুনতে বসিলে তো চলিবে না। শেষটা কি কাজটা পণ্ড হবে না কি? রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, লগ্নভ্রষ্ট করে ফেল্লে দেখ্‌চি।"

রুদ্রকান্ত মাতুলের পৃষ্ঠে থাবা দিয়া কহিলেন,—

"আমি থাক্‌তে তোমার কোন চিন্তা নাই বাবা। তুমি বস, বাজনা শুন। এখনও ৭টা বাজে নাই। ভয় কি?"

এই বলিয়া সজোরে রামকৃষ্ণকে পার্শ্বস্থ মোড়ায় বসাইলেন। রামকৃষ্ণ কলের সঙের ন্যায় বসিলেন। সকলে ইত্যাদি রূপ আমোদ কৌতুকে প্রমত্ত রহিলেন।

এই অতুল আনন্দ সাগর মধ্যে ঘোরতর বিষাদ রহিয়াছে। এই সুখ রাশি মধ্যে একজনের হৃদয় দুঃখের মুর্মুর দহনে দগ্ধ হইতেছে। এই আমোদ স্রোত মধ্যে এক জনের নেত্র অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। এই সমারোহ মধ্যে একজন জগৎ শূন্যময় দেখিতেছে। এই উৎসাহ মধ্যে একজনের হৃদয় হুতাশে পরিপ্লাবিত হইতেছে। দুই তিনটী প্রকোষ্ঠ পার্শ্বস্থ একটী সুপ্রশস্থ প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিমলা রোদন করিতেছেন। নিকটে আর কেহ নাই। সমস্ত দিন তাঁহার নিকটে এক জন দাসী ছিল। অধুনা বিমলা কৌশল ক্রমে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। বিমলা একাকিনী। তাঁহার দেহে সে রূপ নাই, সে ভুবনমোহিনী মাধুর্য্য নাই। বিমলার পূর্ব্বশ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। অদ্য এক সপ্তাহ কাল সরলা বিমলা রুদ্রকান্তের চাতুরীতে পিঞ্জরবদ্ধা হইয়াছেন। এই সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার পরিবর্ত্তনের সীমা নাই। যদিও রুদ্রকান্ত তাঁহার যত্নের ত্রুটি করেন নাই এবং অন্য কোন অত্যাচারে উৎপীড়িত করেন নাই, তথাপি বিমলার চিন্তার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

যে সরলা বালিকা সংসারের কিছুই জানে না, যাহার হৃদয়ে পবিত্রতা ভিন্ন অন্য কিছুরই স্থান নাই, তাঁহার এই ঘোর দুর্দ্দশা। কোথায় অবন্তীপুর, কোথায় জননী, কোথায় যোগেশ আর কোথায় বিমলা? অদ্য বিমলার বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! জোর করিয়া, ছলনা করিয়া, অদ্য—অদ্যই কেন, আর দুই ঘণ্টা পরে বিমলার বিবাহ দিবে! তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে, তাঁহার রুচির বিরোধে, তাঁহার কাকুতি মিনতি, রোদন উপেক্ষা করিয়া নিকৃষ্ট রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবে। রামকৃষ্ণ নিকৃষ্ট বা ঘৃণিত জীব না হইয়া যদি স্বর্গের দেবতা হইত, যদি তাহার রূপরাশি ভুবনমোহন হইত, তাহার বিদ্যা অতুলনীয় হইত, তাহার গুণ অসামান্য হইত, তাহা হইলেও বিমলার হৃদয়ে রামকৃষ্ণের নাম একটীও অঙ্ক পাত করিতে পারিত না। যে হৃদয় যোগেশের তাহা যোগেশেরই। বিমলার হৃদয় তো তাঁহার নয়—তাহা যোগেশের। তবে এ অসম্ভব চেষ্টা কেন? এ কথা বুঝে কে?

একাকিনী বিমলা বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার নিবিড় কুন্তল রাশি অবেণী-সম্বদ্ধ হইয়া, বদনের কিয়দংশ আবৃত করিয়া, ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। গৃহ মধ্যে একখানি শয্যাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। বিমলা তাহা স্পর্শ না করিয়া মৃত্তিকায় বসিয়া আছেন। তাঁহার লোচন যুগল রক্তবর্ণ, বর্ণ মলিন, কেশ রাশি বিশৃঙ্খল, পরিধেয় মলিন, দেহ নিরাভরণ! বিমলা যেন সে বিমলা নহেন। বহুক্ষণ এক মনে বসিয়া, আত্ম অবস্থা চিন্তা করিয়া বিমলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন,—

"এ জীবনে কাজ কি? যে জীবনে সুখ নাই সে জীবন রাখিবার প্রয়োজন কি? না—কাহার জীবন রাখিব? যাহার সম্পত্তি তাহাকে বঞ্চিত করিয়া এ সম্পত্তি রাখিবার প্রয়োজন? না, এ জীবন রাখিব না।"

বিমলা আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অদূরে একখানি পিঁড়ি পতিত ছিল তৎসমীপে গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন সেই পিঁড়ির আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিবেন—পিঁড়ি উঠাইলেন। প্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে একবার নেত্রপাত করিলেন। সংসারে আজ তাঁহার এই শেষ দেখা।

লোচন দিয়া এক ফোটা দুই ফোটা করিয়া বহু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। বিমলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"যোগেশ! প্রিয়তম! প্রাণনাথ! হৃদয়বল্লভ! এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইল না। তোমার নিরুপম বদন আর দেখিতে পাইব না। না পাই—আমার আশা আছে। আমি এ পৃথিবীতে থাকিতে পাইলাম না। আমার কি হইল তাহা তুমি জানিতে পারিলে না। কিন্তু আমার বড় আনন্দ যে আমি তোমারই থাকিয়া মরিলাম। হৃদয়েশ! অভাগিনীর সর্ব্বস্ব ধন যোগেশ! আমার চরমকাল আগত।"

এই বলিয়া বিমলা সেই পিঁড়ি উত্তোলন করিয়া সজোরে স্বীয় মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তাঁহার আঘাত কার্য্য শেষ হইতে না হইতে প্রকোষ্ঠের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল এবং ব্যস্ততা সহকারে যোগেশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন! যোগেশ দেখিলেন বিমলার দেহ রুধিরাপ্লাবিত, চৈতন্য শূন্য, ভূপতিত। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"বিমলা! বিমলা!"

উত্তর পাইলেন না।

"আমার বিমলার এ অবস্থা কে করিল!"

বলিয়া যোগেশ সংজ্ঞা রহিত হইয়া বিমলার শোণিতাক্ত দেহ পড়িয়া গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবী।

সায়ংকালে মালতী সৌধ-শিখরে উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার বদন দারুণ বিষাদ চিহ্নে পরিপূর্ণ; তাঁহার দেহ শ্রীভ্রষ্ট, তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। মালতীর কেশপাশ বিশৃঙ্খল। দেহ আভরণ পরিশূন্য। মালতী

মালতী একাকিনী নহেন, তাঁহার পার্শ্বে কুমুদিনী নাম্নী এক জন প্রতিবেশিনী যুবতী কামিনী উপবিষ্টা।

মালতীর উদ্বেগের কারণ? কেন এ কুসুম সুকুমার লতিকা অকালে শুকাইতেছে? কেন ইহার উৎসাহ, আনন্দ ও সজীবতা বিনষ্ট হইতেছে? কেন এ বসন্তের কোকিল গাইতেছে না? কেন এ নবীনা জরা, মরণ ও বার্দ্ধক্যের সাধনা করিতেছে? ইহার একই উত্তর। রুদ্রকান্তই এই সমস্ত অনর্থের মূল।

রুদ্রকান্তের কলঙ্ক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অবন্তীপুরের আবালবৃদ্ধের মুখে এই কথা। জমীদারের শাসন ভয়ে মুখ ফুটিয়া কেহ এ কথা বলিতে পারিতেছে না, কিন্তু দুই জন ব্যক্তি একত্র হইলেই এই কথার আন্দোলন করিতেছে। রুদ্রকান্ত বিমলাকে হরণ করিয়া বলরামপুরের কুঠিতে রাখিয়াছিলেন। তথায় গঙ্গাগোবিন্দের জামাতা ও পুত্র পুলিসের সাহায্যে রুদ্রকান্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। অধুনা তাঁহারা হাজতে আছেন। এই সংবাদ পল্লবিত হইয়া বিভিন্নরূপ ধারণ করত সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। গঙ্গাগোবিন্দ গৃহদাহের পর সপরিবারে অবন্তীপুর ত্যাগ করিয়াছেন। কেশব তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া রামনগরস্থ নিজ ভবনে রাখিয়াছেন। বরদাকান্ত পুত্রের নিষ্কৃতির উপায় [illegible]নার্থ রামনগরে গিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ঘোর চিন্তায় আছেন। সর্ব্বত্র প্রচার যে, রুদ্রকান্তের চতুর্দ্দশ বৎসর কারাবাস দণ্ড বিহিত হইবেক। একমাত্র সন্তানের এবম্বিধ বিপদে বরদাকান্ত ও তাঁহার পত্নী নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। পুত্রের মুক্তির জন্য তাঁহাদিগকে যে যাহা বলিতেছে, তাঁহারা তাহাই করিতেছেন। বাটীতে পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন পাঠ করিতেছেন ও বরদাকান্তের স্ত্রীকে অভয় দিতেছেন। ব্রাহ্মণ নারায়ণকে তুলসী দিতেছেন। দেবদেবীর পূজা বিহিত হইতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে ষোড়শ উপচারে পূজা দিবার প্রতিজ্ঞা হইতেছে। অনুগত পৌর কামিনীরা আগ তুলিতেছে ও শুভ সংবাদের আশা জানাইতেছে। সকলে আশ্বাস দিতেছে। ওদিকে বরদাকান্ত মোকদ্দমার তদ্বিরে অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। কর্ম্মচারিগণকে উৎকোচ, উকীলের খরচ, ব্যারিষ্টারের ফি, লোকের বক্সিস্ প্রভৃতি অসংখ্য

স্রাবুদে অর্থরাশি ধূলির ন্যায় উড়িতেছে। অর্থ বা সম্পত্তি কিছুরই দিকে তখন আর লক্ষ্য নাই। সাত দিন রুদ্রকান্ত অবরুদ্ধ হইয়াছেন। এই কয় দিনে বরদাকান্ত অন্যূন দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত করিয়াছেন। অধুনা রুদ্রকান্তকে জামিনে খালাস করিবার প্রযত্ন হইতেছে। তজ্জন্য আবেদন করা হইয়াছে। মাজিষ্টেট্ তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। বরদাকান্ত প্রাণপণে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন।

সন্ধ্যা সময়ে মালতী ছাতের উপর বসিয়া পতির এই বিপদের ভাবনা ভাবিতেছেন। যদিও রুদ্রকান্ত তাঁহার প্রতি সদয় ব্যবহারে নিতান্ত বিমুখ, তথাপি মালতী জানিতেন, এ সংসারে রুদ্রকান্তই তাঁহার সর্ব্বস্ব। মালতী নিয়ত কাল রুদ্রকান্তের হিত ও কল্যাণ কামনায় রত। সেই জন্যই পতির অশুভ সংবাদ শ্রবণে সুন্দরী বিরলে বসিয়া ভাবিতেছেন। সেই জন্য তাঁর ঢুলু ঢুলু সুন্দর মুখখানি অদ্য শুষ্ক ও মলিন। সেই জন্যই তাঁহার এই ঘোর দুর্দ্দশা।

অনেকক্ষণ পরে কুমুদিনী কহিল,—

"অনর্থক ভাবনা ভাবিয়া শরীরপাত করিলে কি হবে? আজ্ সাত দিন তোমার স্নান নাই, আহার নাই; ইহাতে কি জীবন থাকিবে? বউ! ওঠ কিছু খাওগে।"

মালতীর নেত্র দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রু পাড়তে লাগিল। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুমুদিনী আবার কহিল,—

"অনর্থক কেঁদে তো কোনই উপকার হবে না। তবে কেন কেঁদে কেঁদে দেহপাত কর।"

মালতী রোদন-বিকলিত স্বরে কহিলেন,—

"ঠাকুরঝি! আমার পোড়া কপাল। আমার মত হতভাগিনী এ জগতে আর কেহ নাই,"—

কুমুদিনী বাধা দিয়া কহিলেন,—

"বালাই! শত্রুর পোড়া কপাল হ'ক। তোমার মত ভাগ্যধরী আর কে আছে?"

মালতী কহিলেন,—

'শুন ঠাকুরঝি! আজ আমার স্বামী হয়ত কত যন্ত্রনা ভোগ করি- তেছেন, কত ক্লেশ পাইতেছেন, আর আমি অভাগিনী পরমসুখে বসিয়া আছি। ছিঃ! আমার মরণই মঙ্গল।"

কুমুদিনী কহিল,—

"তা তোমার দ্বারা তো তাঁর কষ্টের কোনই উপকার হবে না। তবে তুমি কি করিবে?"

"ঠাকুরঝি! তবে স্ত্রী কি জন্যে? আমি যদি তাঁর কোন কাজেই না লাগিলাম, কোন উপকারই না করিলাম, তবে আমি তাঁর কিসের আপ- নার? তবে আমাতে আর পরে প্রভেদ কি?"

মালতী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কহিলেন,—

"তা এর জন্যে এত চিন্তা কি? বড় মানুষের ছেলের এমন কত কি হয়ে থাকে।'

"না ঠাকুরঝি তুমি আমার কাছে মিছে কথা বলো না। সকল লোকেই বল্‌ছে যে এ বড় সর্ব্বনেশে মাদ্দা হয়েছে।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। কুমুদিনী আবার কহিল,—

"বউ! তুমি ছেলে মানুষ। লোকে এক গুণ কথাকে কত গুণ করে বলে; তুমি কি তা জান না? লোকের কথা মনে কত্তে নাই।"

মালতী অতীব ক্লেশব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—

"আমার স্বামীর নিন্দা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। লোকে কেবল সেই কথা বলাবলি করিতেছে। তিনি যে এই ঘটনায় চিরকলঙ্কিত হয়ে থাক্‌বেন, এই আমার বড় দুঃখ।"

"ও কলঙ্ক দু দিনের জন্য, ও কি চিরদিন থাকে?"

মালতী ওকথা না শুনিয়াই বলিলেন,—

"যেখানে তাঁহার কথা উঠিবে, সেই খানেই লোকে যে তাঁহার নিন্দা করিবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে লোকে অশ্রদ্ধা করিবে, তাঁহার নামে যে লোকে ঘৃণা করিবে, আমি সব সহিতে পারি, এ কষ্ট আমার সহিবে না।"

কুমুদিনী কহিল,—

তুমি কি পাগল হয়েছ? লোকের কি সাধ্য, তাঁর কথায় কথা কয়।"

মালতী বলিলেন,—

"ভয়ক্রমে লোকে যদি মনের কথা প্রকাশ না করে, তথাপি তাহাদের মনে তো অশ্রদ্ধা হবে?"

"তা কি করবে বল বউ! সকলই ভগবানের ইচ্ছা। মানুষের কখন কি যে দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়, তার কি ঠিক আছে? তা না হলে আর এমন ঘটনা হবে কেন?"

"দেখ তাঁর কেমন মন তিনি আমার একটী কথাও শুনেন না, আমার কাছে কোন কথাই বলেন না। তা না শুনুন না বলুন, আপনি যদি একটু বুঝে চলেন তা হলে আর কিছুই হয় না।"

"দেখ, তাঁরও তত দোষ নাই। শুনতে পাই মামার কুপরামর্শে এই সব বিপদ ঘটেছে।"

"যার পরামর্শেই হউক, আর যে জন্যই হউক এখন তো সব ঝোঁক তাঁরই ঘাড়ে। মা মঙ্গলচণ্ডীর ইচ্ছায় এবার তিনি খালাস হয়ে এলে আমি তাঁকে আর কখন এমন সব কাজ কত্তে দেব না।"

"তিনি তো তোমার কথা শুনেন না, তুমি তাঁকে বারণ করবে কিরূপে?"

"আমি তাঁর পায়ে ধরবো, তাঁর পায়ে মাথা কুটবো, আর বলবো যে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। তুমি আমাকে এমন করে কাঁদিও না। তোমার কষ্ট হলে, আমার যার পর নাই কষ্ট হয়। তিনি তা হলে, আমার কথা শুনবেন।"

"তা এ রকম কথা এত দিন বল নি কেন?"

"এতদিন ভাবতাম যে, তিনি যা করে সুখী হন, তাই করুন।"

"দাদার ঐ একটী মহৎ দোষ, তিনি কারও কথা শোনেন না।"

"না ভাই! তোমরা তাঁকে জান না। তাঁর মন বড় ভাল। কেবল পাঁচ জনের কুপরামর্শে আর সঙ্গ দোষে তাঁর এই সব ঘটেছে। তাঁর মত সরল প্রকৃতির লোক বড় কম। লোকে যদি এমন করে সর্ব্বনাশ না করতো তা হলে তুমি দেখতে পেতে, তিনি কেমন লোক। মা মঙ্গলচণ্ডি! এই কর যেন, এবার তাঁর কিছু না হয়।"

মালতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

কুমুদিনী বলিলেন,—

"বউ! উঠ অনেক রাত্রি হয়েছে। এখানে আর বসে থাকা ভাল নয়। ঘরে যাওয়া যাউক।"

কুমুদিনীর অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া সরলা, স্বামি-পরায়ণা, কামিনী-কুল-কমলিনী মালতী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুমুদিনী তাহার পশ্চাতে চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার।

রায়নগরে কেশবের ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে যোগেশ ও বিমলা উপস্থিত। যোগেশ প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ কোচে উপবিষ্ট। বিমলা তাঁহারই পার্শ্বস্থ। বিমলার মুখ যোগেশের বক্ষোপরি।

বিমলা বলিলেন,—

"আর যে কখন তোমাকে দেখিতে পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এ সুখ আশার অতীত।"

আনন্দে বিমলার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। যোগেশ সাদরে স্বীয় বস্ত্র দ্বারা বিমলার নেত্র পরিষ্কার করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"বিমল! এখনও তোমার দৌর্ব্বল্য সারে নাই। তোমার ক্ষত সকল সারিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য তোমার যে রক্তক্ষয় হইয়াছে, তাহা এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই। কল্যও ডাক্তার সাহেব আমাকে বলিয়াছেন যে, তোমার শরীর এখনও দুর্ব্বল।"

বিমলা বালিকার ন্যায় যোগেশের বদনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

"কই না! আমি তো কোন অসুখ বুঝিতে পারি না। আমার যে আনন্দ, তাহার কাছে অসুখ আসিতে পারে না।"

যোগেশ কহিলেন,—

"সে কথা মিথ্যা নয়। তোমার আনন্দ মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। চিকিৎসক আমায় বলিয়াছিলেন, এ রোগ ১৫। ১৬ দিনে এরূপ আরোগ্য হওয়া বিস্ময়ের বিষয়। পীড়িতার মনের সজীবতা ও প্রফুল্লতা এবম্বিধ উপশমের মূল।"

বিমলা বলিলেন,—

"যোগেশ! আমি যদি মরিতাম, তাহা হইলে আর তোমাকে দেখিতে পাইতাম না—নয়?"

বিমলার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যোগেশ বিমলার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"বিমলা! তুমি কি ঘোর অবৈধ উপায়ে বিপদ মুক্তির পথ করিয়াছিলে! তুমি তখন জানিতে না যে, সে কার্য্যের পরিণাম কি ভয়ানক।"

বিমলা উত্তর দিলেন,—

"যোগেশ! সে জন্য আমায় আর অনুযোগ করিও না। ভাবিয়া দেখ যোগেশ, তখন আমার কি অবস্থা! তখন ও ভিন্ন আমার নিষ্কৃতির কি উপায় ছিল? যোগেশ, আমি কি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহারও হইতে পারিতাম?"

বিমলা যোগেশের হস্তদ্বয় ধরিয়া তাহাতে স্বীয় বদন রক্ষা করিলেন। যোগেশ বুঝিলেন বিমলার চক্ষের জল তাঁহার হাতে পড়িতেছে। ভাবিলেন সে শোচনীয় কথার পুনরান্দোলন অন্যায়। কহিলেন,—

"বিমলা! নরেন্দ্র মনোরমার ঋণ ইহজন্মে শোধিতে পারিব না।"

বিমলা বলিলেন,—

"আমি এমন সুন্দর লোক দেখি নাই। মনোরমা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। কি আশ্চর্য্য স্বভাব, কি পবিত্র প্রেম। আমার ইচ্ছা করে নরেন্দ্র মনোরমাকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করি। যোগেশ! তোমরা তাঁহাদের সুখের পথ যাহাতে মুক্ত হয় তাহা করিয়া দেও। তাঁহাদের তো কোনই দোষ নাই।"

যোগেশ বলিলেন,—

"কেশব বলিয়াছেন, তিনি চেষ্টা করিয়া নরেন্দ্রকে রায়নগরে কোন ভাল কাজে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। নরেন্দ্র ও মনোরমার বিবাহ হইবে এবং আমরা সকলেই তাঁহাদের লইয়া আনন্দ করিব, ইহা আমাদের স্থির পরামর্শ হইয়াছে।"

"মনোরমার এমন সরল ও শান্ত স্বভাব, তা তোমায় কি বলিব ?"

"তিনি এখন কোথায় ?"

"সরমার কাছে বসিয়া হাসিতেছেন, আর তাস খেলিতেছেন।'

"এ জীবনে যে তাঁহাকে এমন করিয়া হাসাইতে পারিব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

বিমলা কহিলেন,—

"দুষ্ট রুদ্রকান্ত কত লোকেরই কত মত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার সীমা নাই।"

"পাপের কত দিন সয় থাকে ? রুদ্রকান্তের যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের শাস্তি এখন আরম্ভ হইয়াছে। হতভাগা অচিরে বুঝিবে যে, পাপ পুণ্যের বিচার আছে। ধন সম্পত্তির গর্ব্বে গর্ব্বিত পাপিষ্ঠ এখন বুঝিবে যে, সংসারে সকলেই সমান।"

বিমলা কাতর ভাবে বলিলেন,—

"যোগেশ! তাহার কি হইবে ?"

"তাহার যেরূপ অপরাধ, তাহাতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হওয়া সম্ভব।"

মেয়াদে কি হয় ?"

"অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়, আত্মীয় জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় না, অতি কদন্ন সেবন করিতে হয়, জঘন্য বস্ত্র পরিতে হয়, কম্বল গায়ে দিয়া শীত কাটাইতে হয়, পরিশ্রমে বিরত হইলে বা অনিয়ম কার্য্য করিলে মারি খাইতে হয়, ইতরের সহিত বাস করিতে হয়—সে ক্লেশের কথা তোমায় কি বলিব ?"

'ধনবানের সন্তান, পরমসুখে বাস করা অভ্যাস। যোগেশ! রুদ্রকান্ত কেমন করিয়া এই সকল ঘোর ক্লেশ সহ্য করিবে ?"

যোগেশ কহিলেন,—

"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

বিমলা বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন,—

"যোগেশ! আমরা যদি তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করি, তাহা হইলে কি হয়?"

"তাহা হইলেও তাহার সম্পূর্ণ দণ্ড হয়।"

বিমলা দুঃখিত হইয়া নীরবে মস্তক বিনত করিয়া রহিলেন। এই সময় কেশবের একটী পশমওয়ালা, সাদা, ছোট কুকুর সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে, দুলিতে দুলিতে তাঁহাদের পদনিম্নে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বিমলা সভয়ে পদ সরাইয়া লইলেন। কুকুর তাঁহার সেই রাঙ্গা রাঙ্গা ছোট পা দুখানির লোভ ছাড়িতে পারিল না। সে আবার তাঁহার পদ সমীপে গেল। বিমলা বলিলেন,—

"আঃ! আমার বড় ভয় করে।"

পদদ্বয় উঠাইয়া বসিলেন। কুকুর কোচের উপর উঠিল। বিমলা সে স্থান ত্যাগ করিয়া যোগেশের অপর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলে তখন যোগেশ কুকুরটী ধরিয়া বিমলার গায়ে ফেলিয়া দিলেন।

বিমলা কহিলেন,—

"অ্যাঁ—অ্যাঁ—আচ্ছা—তুমি থাক।"

যোগেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বিমলা স্বয়ং কুকুরটী ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুকুর যখন অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, তখন তিনি তাহার লেজ ধরিলেন, কুকুর অমনি তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সভয়ে তাহা ত্যাগ করিলেন। বিমলার বিশেষ চেষ্টা যে কোন রূপে হউক কুকুরটী ধরিয়া একবার যোগেশের গায়ে দিতে হইবে। তজ্জন্য তিনি নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছু-তেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। যোগেশ বিমলার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। সুন্দরী বিমলা তাহাতে আরও কুপিতা হইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ বিমলা চেষ্টা করিলেন—কুকুর ধরিতে পারিলেন না।

যোগেশ তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিমলা কহিলেন,—

"যাও—আমি তো আর কারো গায়ে কুকুর দেব না।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"ছিঃ বিমলা! কুকুর ধত্তে পারলে না।"

বিমলা বলিলেন,—

"তুমি ধর দেখি।"

যোগেশ সীস দিয়া "জেনী" "জেনী" বলিয়া ডাকিলেন। "জেনী" নিকটস্থ হইলে তাহাকে ধরিয়া পুনরায় বিমলার গায়ে দিলেন। বিমলা এবার কুকুর ধরিয়া যোগেশের গায়ে দিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। একবার ধরিলেন, কিন্তু ভয়ে ছাড়িয়া দিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া তখন অবনত মস্তকে যোগেশের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"আমাকে কুকুর ধরিয়া দেও।"

যোগেশ হাসিয়া বলিলেন,—

"কেন।"

বিমলা বলিলেন,—

"আমার দায় পড়েছে, আমি কারো গায়ে দেবো না।"

যোগেশ হাসিয়া উঠিলেন। কুকুর ধরিয়া বিমলাকে দিতে গেলেন। বিমলা কুকুর লইতে পারিলেন না। যোগেশ কুকুর ছাড়িয়া দিয়া বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"বিমলা তুমি সেই পাগলিনী।"

এই সময় সরমা হাসিতে হাসিতে করতালি দিতে দিতে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যোগেশ অপর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। বিমলা কহিলেন —

"কি হয়েছে?"

সরমা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"মনোরমা খেলায় তিন বার হেরেছেন?"

"এই কথা, আমি না জানি কি হয়েছে?"

"ইঃ! আমার সঙ্গে খেলতে পারিস্?"

"আমি মন করে খেল্লে কারো পাত্তে হয় না।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"আচ্ছা কাল দেখা যাবে।"

"মনোরমা কোথায় ?"

পার্শ্বের ঘরে নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কচ্চেন'

"এখানে আস্‌বেন না ?"

"তা কি জানি। বিমল! আমাদের সন্দেশ খাওয়া।"

"কেন — অপরাধ ?"

"বটে ? ডাকি মনোরমাকে ? সন্দেশ নিয়ে আয় বল্‌ছি ভাল।"

"কি করুণ বল।"

"তোর যে বিয়ে"—

"এই কথা—তবু ভাল।"

"কথাটা বুঝি মনে ধর্‌লো না।'

"আমি বিয়ে করবো না।"

"তবে রামকৃষ্ণের গতি কি হবে ?"

বিমলা সাদরে সরমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—

"সরমা, ও পাপ কথা আর তুলো না।'

"তা যাক্—তোর যে সম্প্রতি বিয়ে তা শুনেছিস্ ?"

বিমলা অবনত মস্তকে কহিলেন,

"আমার বিশ্বাস হয় না।"

"সত্তি। বাবা বল্লেন।"

"কি বল্লেন ?"

সরমা সহাস্যে কহিলেন,—

"বলবো কেন ?"

বিমলা কপট ক্রোধে বলিলেন,—

"না বল্লে।"

সরমা বিমলার চিবুক ধরিয়া কহিলেন,—

"বাবা সকলের সঙ্গে বিবাহের পরামর্শ করে দিনস্থির কল্লেন।"

"মিথ্যা কথা।"

"না ভাই সত্তি। আধ ঘণ্টা আগে সব কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে গিয়েছে। দাদাই যে আর উদ্যোগ কত্তে গেল।"

"সবাই কে কে ?"

"এই সবাই গেলো তার আর কি ?

"একতো তোমার তিনি, আর কে ?"

"হাঁরে হাঁ, তাই সবাই।"

"তার পর।"

"বিয়ে হবে অবন্তীপুর গিয়ে, পরশু আমরা সবাই যাব।"

আনন্দে বিমলার চক্ষু দিয়া দুই ফোটা জল পড়িল।

সরমা আবার কহিলেন,—

"নরেন্দ্র মনোরমা যাইবেন, তার পর বিয়ে টিয়ে হয়ে গেলে সকলে এখানে আস্তে হবে। এখানে তাঁদের বিয়ে হবে। বাজারের ধারে যে জমি পড়ে আছে, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ী হবে। নরেন্দ্রের কর্ম্ম ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ের পর তিনি কাজে হাত দেবেন। তাঁর মাকে দেশ থেকে আস্তে লোক যাচ্ছে।"

বিমলা সাদরে কহিলেন,—

"সরমা! এত সুসংবাদ তোমার পেটে ছিল! বৎসরের মধ্যে যেন তোমার কোলে খোকা দেখি।"

সরমা বিমলার বদন চুম্বন করিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি! আমিও যেন তোমার কোলে আমার পিতৃবংশের রতন দেখি। তোমার ক্রোড়ে যেন আমার সোহাগের ভাইপো খেলা করে।"

"মনোরমা এতকথা সব শুনেছেন কি ?"

"বোধ করি না"

"তবে চল ভাই! তাঁকে সব বলিগে।"

উভয়ে হাসিতে হাসিতে বাহিরে গমন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পাশু।

সায়ংকালে মালতী নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া অকূল চিন্তায় ভাসিতেছেন। হৃদয় যখন দারুণ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকে, তখন তাহাতে আর কিছু স্থান পায় না। চিন্তায় মানব-মানস সমাচ্ছন্ন হইলে, তাহাতে আর কোন অবসর থাকে না। সংসারের আনন্দ, উৎসাহ, কোলাহল; প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন; দুরাকাঙ্ক্ষার বিষাক্ত প্ররোচনা; ক্ষুৎ-পিপাসাদি স্বাভাবিক ও অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম; ভোগ সুখাদি অদম্য স্পৃহা, কিছুই তৎকালে মনোরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। মন অবিশ্রান্তভাবে চিন্তা-তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। মালতীর মনের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। স্বামীর চিন্তায় তাঁহার মন সংলগ্ন। নিরন্তর চিন্তায় তাঁহার মন অবসন্ন। তজ্জন্য অধুনা তাঁহার সাংসারিক কোন ব্যাপারেই মন নাই। মালতীর দেহ এই কয়দিনে নিতান্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সে শোভা, সে সৌকুমার্য্য চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছে। মালতী একাকিনী।

এ সংসারে রমণীই সার-রত্ন। রমণী এ সংসারের বিপদবাত্যা-বিঘূর্ণিত তরণীর কর্ণধার। রমণীর হৃদয় অতি উচ্চ, অতি উদার; তাহা প্রীতি, স্নেহ, মমতা ও প্রণয়ের নিকেতন। মালতীর প্রকৃতি কি মনোহর! কি অমানুষী! যে রুদ্রকান্ত স্ত্রীর সহিত এক দণ্ডও আলাপ করিতে হইলে সময় অপব্যয়িত হইল মনে করে; যে হতভাগ্য পত্নীর সুখ, দুঃখের কোনই সংবাদ রাখে না, যে কুলাঙ্গার নিয়ত যাতনানলে পবিত্র-হৃদয়া সাধ্বীর হৃদয় বিদগ্ধিত করে; যে মূর্খ এ সংসারে আত্ম-সুখ, আত্ম সন্তোষ ও আত্ম-আমোদ ভিন্ন আর কিছুতেই লক্ষ্য করে না; যে নরাধম স্বতঃ পরত সতত স্ত্রীর ধর্ম্ম মথিত, বিদলিত ও ব্যথিত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না, সেই পামর স্বামীর কল্যাণ কামনায় যে স্ত্রী এতাদৃশ চিন্তাকুল, নিশ্চয়ই তাহার হৃদয় পার্থিব উপা-

দয়ে গঠিত নহে। বঙ্গীয় কুলকামিনী জগতের ভূষণ। এবম্বিধ প্রশস্ত-চিত্ততা বঙ্গীয় পৌরনারী ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে?

মালতী একাকিনী বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। কিন্তু মালতীর হৃদয়স্থিত অন্ধকারের নিকটে সে অন্ধকার স্থান পাইল না। দাসী গৃহ মধ্যে প্রদীপ দিয়া গেল। মালতী তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। দাসী বলিল,—

"বউ ঠাকরুণ! সমস্ত দিন বসিয়া থাকিবে। সন্ধ্যা হয়ে গেল ওঠ"

মালতীর সংজ্ঞা হইল! তিনি চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দাসী চলিয়া গেল। মালতী উঠিলেন, পরে গললগ্নী-কৃত-বাসা হইয়া সরোদনে কহিলেন,—

"হে মা জগদম্বে! আমার স্বামীকে এ ঘোর বিপদ হইতে নিস্তার কর মা। তিনি যদি বুদ্ধির দোষে একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকেন, দয়াময়ি! তুমি তাঁহাকে মুক্তি দেও। আমি আর তোমায় কি বলিব? তুমি সকলই বুঝিতেছ। তাঁর কষ্ট সহে না যে মা! তাঁর পরিবর্ত্তে যদি আমাকে শাস্তি দিলে হয়, মা আমি তা অনায়াসে সহিতে স্বীকার আছি। তাঁকে আর যাতনা দিও না"—

মালতীর কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি বাহিরে উচ্চ কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে শব্দ রুদ্রকান্তের কণ্ঠ-নিঃসৃত। মালতী আনন্দে উৎফুল্লা হইয়া সেই দিকে ধাবিতা হইলেন। তাঁহাকে প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে হইল না। ঘোর চীৎকার করিতে করিতে রুদ্রকান্ত সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতীর কমনীয় ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া যথার্থ হৃদয় হইতে সমুত্থিত অতি পবিত্র হাস্যের ছটা বাহিরিল। রুদ্র-কান্ত অতি ব্যস্তে ও নিরতিশয় নৃশংস স্বরে কহিলেন,—

যোগেশকে এ সংবাদ কে জানাইয়াছিল?

"কেন?"

রুদ্রকান্ত সজোরে মালতীর কেশাকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—

"কেন—এই দেখ কেন?"

এই বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা মালতীর নবনীত-নিভ গাত্রে প্রচণ্ড

আঘাত করিতে লাগিলেন। মালতী বলিতে লাগিলেন,—

"আমার দোষ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা কর। তুমি আগে বিশ্রাম কর পরে আমার যা হয় দণ্ড করো।"

ক্রোধে তখন রুদ্রকান্তের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শরীর কম্পিত হইতেছে। তিনি কহিলেন,—

"হতভাগী! ক্ষমা! তোমায় ক্ষমা একেবারে করিতেছি দাঁড়াও।"

তিন চারি আঘাতের পর মালতী বলিলেন,—

"তোমার পায়ে পড়ি আমায় আর মারিও না।

নির্দ্দয় রুদ্রকান্ত দ্বিগুণ বলে সেই সুকুমার দেহে আঘাত করিতে লাগিল। কহিল,—

"জানিস্ না আমি কে?"

"তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।"

বলিতে বলিতে মালতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পাপিষ্ঠ, পশু স্বভাব, নরকুল-কলঙ্ক রুদ্রকান্ত সেই ভূপতিত প্রসূনবৎ ভুবন-মোহিনী কান্তিকে পদাঘাত করিতে লাগিল। তখন মালতীর নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে ও তাহা স্থির হইয়াছে। দেহ অবসন্ন ও কঠিন হইয়াছে। সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়াছে। দন্তে দন্ত সংলগ্ন হইয়াছে। বাক্য-কথনের শক্তিহীনা মালতীর মুখ হইতে কেবল একটী অপরিস্ফুট যন্ত্রণা ব্যঞ্জক ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে।

এবম্বিধ গোলমাল শব্দ শুনিয়া পৌরজনেরা ব্যস্ত হইয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। রুদ্রকান্তকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? তাঁহার শরীরে তখন বন্য-জীবের ন্যায় শক্তি। নর-প্রেত রুদ্রকান্ত তখন বন্য-জীবাপেক্ষাও ঘৃণিত ও বিচারবিগর্হিত কার্য্যে রত। কোনরূপে তাহারা পাষণ্ডকে ধরিয়া অতি ক্লেশে স্থানান্তরে রাখিয়া পরে সকলে সমবেত হইয়া মালতীর শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। দেখিল—মালতীর জীবনাশা নাই।

বরদাকান্ত অদ্য পুত্রকে জামিনে খালাস করিয়া বাটী লইয়া আসিয়াছেন। তিনি আনন্দিত মনে বাহিরে বসিয়া লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার নিকট এই ভয়ানক সংবাদ পৌঁছিল।

তিনি দৌড়িয়া আসিলেন। দেখিলেন, বিপদের উপর বিপদ! উপস্থিত বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। মালতী বাঁচিবেন না।

হায়! ইহারই নাম দাম্পত্য প্রণয়। এ দুঃখের কথা কাহারে বলিব? চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিলে যাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিবে; মুখ ভার দেখিলে যাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে; শয়নে, স্বপ্নে, সর্ব্বকার্য্যে যে মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিবে; যাহার সুখ ও সন্তোষ সংসাধন প্রধান চেষ্টা স্বরূপ হইবে, যে হৃদয়ের দিকে অপরের হৃদয় দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় নিরন্তর স্থির থাকিবে, তাহাদের এই ঘোর নৃশংস, অবক্তব্য, অবিবেচ্য অত্যাচার ও হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা নয়ন মুদিয়া নিদ্রার আবেশে ভাবিতেও শরীর শিহরে ও কণ্টকিত হয়। কে জানে বিধাতা এ পাপময় সংসারে কত আশ্চর্য্য জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন? কে জানে এ সংসারে আরও কত অচিন্তিতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে? ধিক্! পামর রুদ্রকান্তকে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

সন্ধ্যার পর সরমা ও মনোরমা বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময় সেই স্থানে কেশব আগমন করিলেন। মনোরমা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। কেশব কহিলেন,—

"সরমা! অবন্তীপুর যাওয়ায় তো বিলম্ব পড়িল।"

সরমা ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসিলেন,—

"কেন?"

"সেখানকার বাটী এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। আরও ১০।১৫ দিন না যাইলে তাহা শেষ হইবে না।"

"বিবাহ কি তবে তত দিন পরে হইবে?

"কাজেই।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"না, তা হবে না।"

"তুমি কি বল।"

"আমোদে বিলম্ব ভাল লাগে না।"

"আমোদ তো করলেই হয়।"

"বিবাহ না হলে আমোদ হয় কিসে ?"

কেশব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"আমোদ করিয়া এক দিন এর মধ্যে আমোদের বিবাহ দেও না কেন ?"

"সে কি রকম ?"

"কেন, সকলে মিলে আমোদ করে যোগেশ বিমলার বিবাহ দেওয়া যাউক, পরে আবার যথারীতি বিবাহ হইবে। লাভের মধ্যে এক কার্য্যে দুই দিন আমোদ হইবে।"—

সরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"বেশ বলেছ। তোমার এতও যোগায়। তবে তার যোগাড় কর।"

"এর আর যোগাড় কি ? এত হলেই হল।"

"তবে তুমি যোগেশকে ডাক। আমি বিমলা, মনোরমা সবাইকে ডাকিতেছি।"

"তা আজ কেন। আর একদিন হলেই হবে।"

সরমা বলিলেন,—

"না আজই হউক। তুমি যোগেশ নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আন আমি বিমলাকে আনিতেছি।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন। অনতিবিলম্বে যোগেশ ও কেশব সেই স্থানে আসিলেন। যোগেশ কহিলেন,—

"ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপার দেখিতেই পাবে।"

"আমার বিরোধে তোমাদের কোন চক্রান্ত আছে না কি ?"

"রুদ্রকান্ত জামিনে খালাস্ হয়েছে—তারই চক্রান্ত।"

"তার আবার কি চক্রান্ত ?"

"রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিমলার বিবাহ।"

যোগেশ হাসিয়া উঠিলেন। কেশব কহিলেন,—

"হাসি নয়। সত্যই আজ বিমলার বিবাহ, তোমাকে দেখাব এখন।"

বলিতে বলিতে বাহিরে অলঙ্কার-ধ্বনি হইতে লাগিল। বিমলার দেহের সর্ব্বত্র আজ মূল্যবান অলঙ্কারে পরিশোভিত। তাঁহার এক হস্ত সরমা অপর হস্ত মনোরমা ধরিয়া সেই প্রকোষ্ঠে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে কতকগুলি পৌরকামিনী আসিল। বিমলা ব্রীড়াসহকারে একদিকে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—

"সরমা! ছি ভাই, আমি যাই।"

যোগেশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

"কেশব! এ সকল কি ছেলেমি হচ্চে?"

এমন সময় সেই স্থানে নরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—

"কেশববাবু বেশ আমোদ। আমাকে ফাঁকি দিয়ে কাজটা ভাল হচ্ছিল কি?"

"বিলক্ষণ, আপনাকে ফাঁকি দিলে চলিবে কেন? আপনি একজন প্রধান। আপনি এসব মন্ত্রণা শুনলেন কোথায়?"

"আমি এসেই দেখলেম বৈঠকখানা ফাঁক। সেধোকে জিজ্ঞাসিলাম, সে বল্লে বিবাহ। কথাটা বোঝা গেল।"

কেশব মনোরমাকে অস্ফুটস্বরে কহিলেন,—

"ভগ্নি! সরমাকে জিজ্ঞাসা কর দান কর্‌বে কে?"

মনোরমা জিজ্ঞাসিয়া বলিলেন,—

"আপনি। তাহাতে কোন বাধা নাই।"

যোগেশ কোচের উপর বসিয়াছিলেন। কেশব বিমলার হস্ত ধরিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি! এদিকে এস।"

বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইলেন। সরমার বদন-কমল অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃত। তিনি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"যা না—

কলের পুত্তলীর ন্যায় বিমলা কেশবের পশ্চাতে চলিলেন। বিমলার

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেহ এই কয় দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। অনুরাগ, আনন্দ ও চিন্তা-হীনতায় তাঁহার লাবণ্য শতগুণ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভূষণে ভূষিতা হওয়ায় সেই স্বভাব-সুন্দরী শ্রী অদ্য বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছে। কেশব বিমলাকে যোগেশের সমীপে আনিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং উভয়ের হস্ত একত্রিত করিয়া কহিলেন,—

"ভাই যোগেশ! বিমলাকে বিধাতা যে নিরুপম গুণ ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন তাহার পরিচয় তুমি আমার অপেক্ষা সমধিক অবগত আছ। তোমাদের হৃদয় মধ্যে যে প্রণয় আছে, তাহা অবিনশ্বর ও স্বর্গীয় সম্পত্তি। বিপদে বা সম্পদে, দর্শনে বা অদর্শনে, কিছুতেই সে পবিত্র প্রণয়ের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। দৈব বিড়ম্বনায় এমন সুকুমার প্রসূনদ্বয় একত্রে শোভা বিকাশ করিতে পার নাই। অদ্য পরমানন্দে আমরা সকলে এই অমূল্য কুসুমদ্বয়কে একত্র করিয়া দিলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন অনন্ত কাল ইহারা সদ্ভাবে জগতের শোভা সম্পাদন করিতে করিতে করিতে কাল পাত করে।"

কেশব যোগেশের করে বিমলাকে সমর্পণ করিয়া উভয়কে এক কোচে বসাইলেন। সকলে মঙ্গল-সূচক উলুধ্বনি করিল। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। বাহিরের বৈঠকখানা হইতে গঙ্গাগোবিন্দ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"বাড়ীর মধ্যে গোল কিসের হে?"

কেশব হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—

"আজ্ যোগেশ বিমলার বিবাহ হইল।"

কেশব পুনরায় গৃহ প্রবেশ করিলে যোগেশ বলিলেন,—

"তুমি এতও জান।"

বিমলা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। সময়ে সময়ে উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কৃত-কার্য্য হইলেন না। তখন যোগেশ কহিলেন,—

"এখন ছুটী দেও।"

কেশব হাসিয়া কহিলেন,—

"দাঁড়াও, উপদেশ দিই। ব্রহ্মজ্ঞানীরা বিবাহের পর উপদেশ দেয় জান না?"

যোগেশ বলিলেন,—

"ঢের হয়েছে।"

কেশব কহিলেন,—

"বিমলা! স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয় তাহা আমি আর তোমায় কি শিখাইব? তবে কর্ত্তব্যবোধে দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। স্বামী পরম দেবতা, অর্থাৎ স্বামীর চরণ দর্শন করিলে ভব-সিন্ধু পার হইয়া দিব্য-লোকে যাওয়া যায়, স্বামীর পাদোদক পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না, স্বামীকে প্রভুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া দাসীর ন্যায় থাকিতে হয়, স্বামী কুপিত বা অসন্তুষ্ট হইলে নরকাগ্নিতে পুড়িতে হয়, প্রভৃতি যে সকল কথা সতত শুনিয়া থাক, যদি তুমি তোমার স্বামীর সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার প্রণয়ের পবিত্রতা থাকিবে না, তোমার হৃদয়ে সুখ জন্মিবে না, আনন্দ ও শান্তি তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে। ভগ্নি! স্ত্রী স্বামীর হিতৈষিণী সখি, স্বামী স্ত্রীর হিতৈষী সখা। একের সুখ দুঃখ অপরের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ। পরম পবিত্র, অবিচ্ছেদ্য, স্বর্গীয় আত্মীয়তা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। স্ত্রী দাসী, বা স্বামী প্রভু এ পাপ কথা ভ্রমেও মুখে বা মনে আনিতে নাই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ বা কেহ ইতর হইতে পারে না। সেত দূরের কথা—স্বামী স্ত্রী সর্ব্বাংশেই অবিকল তুল্য। ভগ্নি! তুমি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। তোমায় আমি অধিক আর কি বলিব? স্বামীকে নিয়ত কাল সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে, তাঁহার বিষয় কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে, বিপদে সহায় স্বরূপ হইবে, সম্পদে আনন্দময়ী সঙ্গিনী হইবে এবং তাঁহার আত্মায় নিজ আত্মা ঢালিয়া দিয়া সুখ-সাগরে ভাসিবে। বিধাতার পদে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের হৃদয়ে কদাচ কোন অসুখ না জন্মে। আর যোগেশ! পত্নীর সুখ, সন্তোষ সম্বিধানার্থ সতত চেষ্টিত থাকিবে।"

যোগেশ বাধা দিয়া কহিলেন,—

"আবার আমায় কেন লেক্‌চর? এক দিক দিয়েই চলুক।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কেশব আবার বলিতে লাগিলেন,—

"পত্নীর সহিত—"

যোগেশ উঠিয়া বলিলেন,-

"আজ কেশব জ্বালালে।"

নরেন্দ্র বলিলেন,—

"কেশব বাবু যাহা বলিতেছেন তাহা অতি আদরণীয় কথা। যোগেশ তাহাতে বাধা দেও কেন?"

যোগেশ ইত্যবসরে মনোরমার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ভগ্নি! তোমাদের চিরপোষিত বাসনা অতৃপ্ত কেন থাকিবে?"

এই বলিয়া মনোরমাকে নরেন্দ্রের সমীপস্থ করিলেন এবং উভয়ের হস্ত একত্রিত করিয়া কহিলেন,—

"ভ্রাতঃ নরেন্! আজ আমি সর্ব্ব সমক্ষে, উচ্চ শব্দে জগৎকে জানাইয়া, তোমার করে পবিত্রা, সাধ্বী মনোরমাকে সমর্পণ করিলাম। মনোরমা জীবনে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর তাঁহার দুঃখের কোনই কারণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম মনোরমাকে সুখী করিব, অদ্য আমি তৎসাধনে সমর্থ হইলাম, ইহা আমার অতুল আনন্দ? প্রার্থনা করি, তোমরা চিরসুখী হও। তোমাদের নিকট আমি যে ঋণে বদ্ধ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; এ জীবন তোমাদের জন্য ব্যয় করিলেও তাহার পরিশোধ হয় না। তোমাদের যদি পর বলিয়া মনে হইত, তাহা হইলে সে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আমি তোমাদের সুখী দেখিলেই পরমানন্দিত হইব। জগদীশ্বর করুন যেন সে আনন্দ আমি চিরদিন অব্যাঘাতে সম্ভোগ করিতে পারি।"

নরেন্দ্র মনোরমা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুনরায় উলুধ্বনি ও শঙ্খশব্দ ঘোষিত হইল। যোগেশ কহিলেন,—

"নরেন্! কেশব বাবুর লেক্‌চর শুনিতে বড় ব্যাকুল হইয়াছিলে না? এখন শোন যত পার। কেশব লেক্‌চর দেও।"

কেশব হাসিয়া কহিলেন,—

"এবারকার সব ভার তোমার উপর।"

যোগেশ বলিলেন,—

"আমারি অন্ত আসে না।"

কেশব বলিলেন,—

"এক বাড়ীতে দুটো দুটো বিবাহ হল, তা লুচি কই? চল আহারের যোগাড় করা যাউক।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন। রমণীগণ ব্যতীত অপর সকলে বাহিরে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তিমে।

বেলা প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। মালতী সমভাবে শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। দুইজন সুচিকিৎসক তাঁহার উভয় পার্শ্বে বসিয়া যথামত ঔষধাদি সেবন করাইতেছেন। কিঞ্চিৎ অন্তরে বরদাকান্ত বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছেন। শয্যার পার্শ্বে রুদ্রকান্তের জননী বসিয়া নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। ঘরের বাতায়ন সমীপে প্রতিবেশিনী কামিনীগণ দাঁড়াইয়া এই শোচনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছে। সকলেই ম্রিয়মাণ; সকলেই ঘোর চিন্তায় চিন্তিত। বহুক্ষণ পরে বরদাকান্ত কহিলেন,—

"ভগবান্! এ কি বিপদ ঘটাইলে?"

চিকিৎসক পীড়িতার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। যন্ত্রদ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলের গতি পরীক্ষা করিলেন। পরে হতাশ স্বরে কহিলেন,—

"মহাশয়! পীড়িতার জীবনের আশা নাই। আর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মধ্যে তাঁহার জীব লীলার শেষ হইবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র রুদ্রকান্তের জননী আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পৌরবর্গেরা কাঁদিয়া উঠিল। চিকিৎসকদ্বয় গাত্রোত্থান করিলেন। বরদাকান্ত সরোদনে জিজ্ঞাসিলেন,——

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মহাশয়! আমার কি হইবে? আপনারা যাইবেন না, আমাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিন।"

এই সময় মালতী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন; পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা পুনরায় নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। কহিলেন,—

"আর অধিক বিলম্ব নাই। যদি ইচ্ছা করেন তবে এই সময় যথা-কর্ত্তব্য করুন।"

সকলে অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চিকিৎসকদ্বয় এই অবকাশে প্রস্থান করিলেন। বরদাকান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে গিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন অধীন ব্যক্তি ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা আসিয়া মালতীর শয্যা ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সকলে উচ্চস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একজন বরদাকান্তকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,——

"মহাশয় শোক করিতেছেন কেন? কাঁচা ছেলে। কাল পরী ধরে নিয়ে এসে বিবাহ দেওয়া যাবে। ইহার জন্য চিন্তা কি? ভাল বই মন্দ হবে না।"

বরদা কহিলেন,—

"আ—আমার কপাল। আমি কি সেজন্য ভাবিতেছি? আজ যদি আমি মনে করি কাল্ আমার দুশো পুত্রবধূ হয়, সে জন্য কিসের ভাবনা! ভাবনা এই যে, রুদ্রকান্ত আমার দুধের গোপাল। সে কিছু জানে না। ছেলেমানুষ বুঝতে না পেরে একটা কাজ করেছে, তাই তার যে কি হবে, সেই ভাবনা।"

এ পাপ পৃথিবীতে বরদাকান্তের সংখ্যা যত কম হয়, ততই মঙ্গল।

লোকজন নীরব রহিল। বরদাকান্ত হা হুতাশ করিতে লাগিল। পৌর কামিনীরা ক্রন্দন করিতে লাগিল। মালতী নয়ন উন্মীলন করিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কহিলেন,—

"স্বামী—"

একজন স্ত্রীলোক কহিল,—

"একবার রুদ্রকান্তকে ডাকিয়া পাঠাও।"

একজন ডাকিতে গেল। পাপিষ্ঠ রুদ্র এসময়েও পত্নীর সহিত চিরকালের মত একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিল না।

একজন স্ত্রীলোক বলিল,—

"কি চমৎকার স্বামি-ভক্তি, স্বর্গের দ্বার মালতীর জন্য খোলা রহিয়াছে।"

মালতী আবার একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যাহাকে দেখিতে চাহিতেছেন সে সেখানে নাই। মালতীর চক্ষু দিয়া এক ফোটা জল পড়িল। সন্নিহিত কুমুদিনী বস্ত্র দ্বারা মালতীর চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দিয়া কহিল,—

'বউ কি বল্‌ছ?"

মালতী আবার চারি দিকে চাহিলেন। আবার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। অতি অস্ফুটস্বরে কষ্ট সহকারে কহিলেন,—

"ঠাকুর—"

সকলে বরদাকান্তকে বলিল,—

"আপনি এ দিকে আসুন।"

তিনি নিকটস্থ হইলে মালতী তাঁহার চরণ লক্ষ্য করিয়া মস্তকে হস্ত দিলেন। এক জন কামিনী বরদাকান্তের পদধূলি লইয়া মালতীর মস্তকে দিল। মালতী পূর্ব্ববৎ কহিলেন,—

"ঠাকুরাণী—"

কুমুদিনী তাঁহারও পদধূলি লইয়া পূর্ব্ববৎ মালতীর মস্তকে দিল। মালতী তখন স্বীয় ক্লেশ নিপীড়িত দৃষ্টি একে একে সকলের প্রতি অর্পণ করিলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিল ও কহিতে লাগিল,—

"এমন সোণার প্রতিমা আর হবে না।"

মালতীর চক্ষু দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল। কুমুদিনীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—

"কুমুদ,—"

কুমুদ কাঁদিতে লাগিল। মালতী আবার কহিলেন,—

"শেষকালে এক বার দেখিতে পাইলাম না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মালতীর কণ্ঠ স্বর নিতান্ত অস্ফুট, নিতান্ত ক্ষীণ। তিনি পুনরপি কহিলেন,—

তাঁহার কোন দোষ নাই—"

ঊর্দ্ধে হস্ত তুলিয়া পুনরায় কহিলেন,—

"ভগবান্ তাঁহাকে ক্ষমা করুন।"

মালতী আবার নীরব। ক্ষণপরে আবার কহিলেন,—

"আমি তো—মরি, তাঁর যেন—কিছু না—হয়—স্বামী আঃ—স্বামী—"

কুমুদিনী ঘোর চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মালতী আবার কহিলেন,—

"কুমুদ! কেঁদো—না—ভাই—আমার জন্য আঃ—"

কাঁদিতে কাঁদিতে কুমুদ কহিল,—

"বউ! আমাদের ছেড়ে কোথা চল্লি।"

"কুমুদ—ভয় কি—ভাই—আঃ—স্বামী-

কুমুদ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

"তুমিই ধন্য! যাহার অন্তিম সময়ে সেই স্বামীর নাম মুখে লেগে আছে, সে স্বর্গে যাবে! বউ! তোমার সার্থক জন্ম।"

মালতী আবার কহিলেন,—

"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।—না হউক—তিনি মনেই আছেন। তাঁকে বলো—যে আমি তাঁরই দাসী—যেখানে যে অবস্থায়—থাকি—তাঁর—কুমুদ—আঃ—হিত আমার—"

মালতী নীরব। তাঁহার নেত্রদ্বয় স্থির হইল। বাক্যকথনের ক্ষমতা প্রায় লোপ হইয়া আসিল। শরীর স্পন্দহীন হইল। দেহ স্থির হইল! কুমুদ কাঁদিয়া উঠিল। মালতী কহিলেন—

"কুমুদ—স্বামী।"

আর কথা মালতীর মুখ দিয়া বাহিরিল না। ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল। প্রাণ-বায়ু দেহাশ্রয় ত্যাগ করিল। প্রফুল্ল কুসুম রাশির ন্যায় মালতীর প্রাণ হীন দেহ ধরণী-পৃষ্ঠে পড়িয়া রহিল। প্রফুল্ল স্বর্ণলতিকা অকালে শুকাইয়া গেল। পাষাণ, হৃদয়-হীন, স্বামীর

হস্তে পড়িয়া জীবনে তাঁহার আদর,আনন্দ বা সুখ হইল না। কষ্ট ভিন্ন, সুখ মালতী কদাচ দেখিতে পান নাই। মৃত্যু আসিয়া সেই সমস্ত ক্লেশ-রাশি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার জীবনকে লোকান্তরে লইয়া চলিল। এরূপ অসামান্য সাধ্বীর নিমিত্ত স্বর্গের মণিময় সিংহাসন অবশ্যই প্রদত্ত হইবে। অবশ্যই তাঁহার পথে সুরুভিসম্পন্ন কুসুম-রাশি বিস্তৃত হইবে। অবশ্যই ধর্ম্ম স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইবেন। সংসারের ক্লেশ, যাতনা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মালতীর আত্মা স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্থান করিল। তাঁহার তদবস্থা দর্শনে সকলে উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে উন্মত্তবৎ অধীরতা সহকারে লাফাইতে লাফাইতে দুরাচার রুদ্রকান্ত সেই স্থানে প্রবেশ করিল, এবং মালতীর দেহের নিকটস্থ হইয়া ঘোর চীৎকার সহকারে কহিতে লাগিল,—

"আমি তার মাথা ভাঙ্গিবো। কে আমার মালতীর এমন দশা করিল?"

এই বলিয়া হস্তস্থিত লাঠি সজোরে ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। সকলে তাহার এই ভাব দেখিয়া অবাক্ হইল। এমন সময় বাহির হইতে ৪।৫ জন লোক আসিয়া কহিল,—

"পলাও পলাও, দেখিতেছ কি, বাবু পাগল হইয়াছেন। শীঘ্র ধরিবার চেষ্টা কর।"

বরদাকান্ত "এ আবার কি সর্ব্বনাশ! ভগবান্, তোমার মনে কি এও ছিল।" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রুদ্রকান্ত কহিলেন,—

"চোপ রও। মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব। মালতী, মালতী, আমার মালতী।"

এই বলিয়া মালতীর জীবন-হীন দেহ উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

বরদাকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—

"তোমারা দেখ্‌ছ কি? শীঘ্র ধর ওকে।"

লোকেরা আসিয়া রুদ্রকান্তের লাঠি কাড়িয়া লইল। রুদ্রকান্ত কহিল,—

"ও——মালতীকে নেবে———ড্যাম—"

তাহারা সজোড়ে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। রুদ্রকান্ত কহিল,—

"আমার মালতীকে আর মারিস্‌নে। খবরদার! আহা সোণার অঙ্গে ধুলো লাগে না যেন——"

তাহারা সকলে রুদ্রকান্তকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া চলিল। বরদাকান্ত প্রভৃতি সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। পৌর কামিনীরা মালতীর মৃতদেহ পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

উপসংহার।

—:০:—

বিচারক সমীপে রুদ্রকান্ত উন্মত্ত প্রমাণিত হইয়া গারদে প্রেরিত হইলেন। রামকৃষ্ণের কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাবাস দণ্ড হইল।

বরদাকান্ত বিষয় ব্যাপারে উদাসীন হইয়া সস্ত্রীক কাশী বাস করিলেন। তাঁহার জমিদারী খাজনার অভাবে এবং দেনার দায়ে লাটে উঠিল। কেশবের সাহায্যে গঙ্গাগোবিন্দ তাহার অনেক ভাগ ক্রয় করিলেন।

নরেন্দ্র ও মনোরমা বিবাহিত হইয়া রামনগরে বাস করিতে লাগিলেন।

যোগেশ ও বিমলা সুখ সলিলে নিমজ্জিত রহিলেন। তাঁহারা ইচ্ছামত কখন বা রামনগরে, কখন বা অবন্তীপুরে বাস করিতে লাগিলেন।